রাশিয়া থেকে ফিরে

পরিব্রাজক

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—আড়াই টাকা—

প্রচ্ছদপট :—

অঙ্কন—শ্রীঅখিল গাঙ্গুলী

ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমতী মীরা মজুমদারকে

ভূমিকা

আমি "ক্যাসিয়াস" নামে প্রতি শনিবার হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় একটি ব্যক্তিগত স্তম্ভ লিখে থাকি। সেই নামেই, সেই পত্রিকায়ই রাশিয়া থেকে ফিরে এসে দশটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেগুলির অনুবাদ আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখন পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে। ইংরেজীটা ছিল আমার, অনুবাদ আমার এক বন্ধুর।

পুনঃ প্রকাশের অনুমতির জন্য আমি আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

পরিব্রাজক

রাশিয়া থেকে ফিরে

উপক্রমণিকা

আফগানিস্তান এবং রাশিয়া সম্পর্কে এই প্রবন্ধমালা লিখতে বসে আমার মনে হয়েছে এ-দুটি দেশে যাবার আগেই যদি এই প্রবন্ধগুলি আমি লিখতাম, তা হলেই হয়ত ভাল হত। আর কিছু না হক, কাজটা আমার পক্ষে সহজতর হত, তাতে সন্দেহ নেই। আফগানিস্তান। আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়াও শক্তিশালী দেশ। এ-দুটি দেশের সরকার সম্পর্কে কী বলা উচিত, সে-বিষয়ে আগে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। এখন নেই। দূর থেকে আগে যাকে ভাল অথবা মন্দ বলে জানতুম, তারই আর-একটু সান্নিধ্যে এসে এখন দেখছি, "ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধার গিয়েছে মিশি।" সফদরজং বিমানঘাটির শুল্ক-কর্মচারীদের জানবার কথা নয়, দিল্লী থেকে তিনটি বাক্স নিয়ে আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম, দুটি বাক্স নিয়ে ফিরে এসেছি। একটি বাক্স পথেই খোয়া গিয়েছে। আফগানিস্তান এবং রাশিয়া সম্পর্কে আমার এতকালের ধারণা এবং বিশ্বাস তাতে সযত্নে সঞ্চিত ছিল। বাক্সটিতে কি তালা লাগান ছিল না? আমার

বিশ্বাস, ছিল। আসলে নিশ্চয়ই ছিল না। এবং, হয়ত সেই কারণেই, এ-দুটি দেশের জীবন সম্পর্কে আমার যা-কিছু অভিমত—কখনও যার কোনও পরিবর্তন ঘটবে বলে আমি ভাবিনি—তার প্রায় সবই সেই বাক্স থেকে একে-একে অদৃশ্য হয়েছে।

দিল্লীতে ফিরে আসবার পরেও প্রায় অনেক দিন অতিক্রান্ত হল। অথচ, আজ পর্যন্ত এই পরিক্রমা সম্পর্কে আমি কিছু লিখে উঠতে পারলাম না। এর আগে আর কখনও কিছু লিখতে আমার এত সময় লাগেনি। এবারে লাগছে। দোষটা আমার নয়, বিষয়বস্তুর। সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে যিনিই যা-ই লিখুন, দু পক্ষের এক পক্ষ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবেই। আমার আফ-গানিস্তান সম্পর্কেও কিছু বলা খুব সহজ নয়। অন্তত তাঁর পক্ষে নয়,—অনুর্বর, অনগ্রসর এই দেশটি সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে খুব খানিকটা অশ্রুমোচন করতে যিনি একান্তই অনিচ্ছুক। আর তা ছাড়া, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম। তাতে বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে। এই প্রবন্ধমালা যখন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বিজ্ঞপ্তিতে আমাকে নিরপেক্ষ লেখক বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিটা যিনি লিখে দিয়েছেন, তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। যদিচ, "নিরপেক্ষ" বলতে ঠিক কী যে

বোঝায়, তা আমার জানা নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ভারত, আফগানিস্তান অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের কোনও মতামতের অপেক্ষা আমি রাখি না। যা-কিছু মতামত এখানে ব্যক্ত হবে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার। কিন্তু এই "আমি"ই বা কে ? দেশ কাল এবং রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে কী তার সম্পর্ক ?

* * *

লেখার কাজটা আগে নিশ্চয়ই এত কঠিন ছিল না। অন্তত কোপারনিকাসের আগে। তিনি এসেই সব তালগোল পাকিয়ে দিলেন। কোপারনিকাস পোল্যাণ্ডের লোক। পোল্যাণ্ডের লোকসঙ্গীতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, চলিষ্ণু সূর্যকে তিনি থামিয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই নির্দেশে স্থির পৃথিবী এখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। আইনস্টাইনের আমলে ব্যাপারটা যে আরও খানিকটা জটিল হয়েছে, তাতে সন্দেহ করি না। এঁদের আগে দেশকাল সম্পর্কে আমাদের মনে স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল, এবং আমরা ভাবতে পারতুম যে, পৃথিবীর যে-অংশে আমরা অবস্থান করছি, সেটা স্থির, তার কোনও পরিবর্তন নেই। শুধু

তা-ই নয়, এমন কথাও ভাবা সম্ভব ছিল যে, নির্দিষ্ট একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এবং দৃশ্যমান জগতের যে চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্য সকলেও—যদি না তাঁদের দৃষ্টিশক্তির কোনও দোষ ঘটে থাকে—ঠিক সেই চেহারাই দেখতে পাবে। পদার্থ বিজ্ঞানে এ-সব কথার এখন আর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও কম। একটা-কিছু সংজ্ঞা তবু খুঁজে বার করা দরকার। কথা না বাড়িয়ে এখন সেই চেষ্টাই আমি করব।

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিমানযোগে দিল্লী থেকে আমার যাত্রারম্ভ। দিল্লী থেকে কাবুল। কাবুলে আমি একদিন ছিলাম। সেখান থেকে তারমিজ। তারমিজে ছিলাম ঘণ্টাখানেক। তারপর তাসকেন্তে পৌঁছে পুরো একদিনের বিশ্রাম। সকালে উঠে আবার যাত্রারম্ভ। তাসকেন্ত থেকে মস্কো যেতে বিমানযোগে ১৩ ঘণ্টা সময় লাগে। মাঝখানে কয়েকটি জায়গায় বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। সে-সব জায়গার নামমাত্র আমি জানি, এবং সেই নামগুলিও যে ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারব, এমন ভরসা আমার নেই। মস্কোতে ছিলাম ছ দিন। ছটি দিনই আমাকে নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ। লেনিনগ্রাদে তিন দিন। এ-তিনটি দিন তেমন

ব্যস্ত ছিলাম না। তারপরেই দেশে ফিরতে হল। সেই পুরনো পথ। তাসকেন্ত, তারমিজ, কাবুল, দিল্লী। আবহাওয়া খারাপ থাকায় ফিরতি-পথে একটা রাত তারমিজে কাটাতে হল। এবং অতিরিক্ত তিনটি দিন কাবুলে। হেতুটা আর কিছুই নয়, কখন যে আমাদের বিমান আসবে, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ করপোরেশন তা জানতেন না। জানবার জন্য আদৌ কোনও চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন কি না, তা আমার অজ্ঞাত।

পাঠককে মনে রাখতে অনুরোধ করি, এই প্রবন্ধমালায় যাকিছু অভিমত আমি প্রকাশ করতে বসেছি, শুধুমাত্র এই কটি দিন, এবং এই কটি স্থান সম্পর্কেই তা প্রযোজ্য। স্থান অথবা দিনক্ষণ, কোনও কিছুর নির্বাচনেই যদিচ আমার হাত ছিল না। সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে হয়ত আরও কিছু সময় নেওয়া আমার উচিত ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। অত্যন্তই দ্রুত—ইংরেজীতে যাকে বলে লম্ফ দিয়ে—আমাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে। ধীরেসুস্থে গিয়ে পৌঁছবার মতন সময় আমার ছিল না। আগেই সেটা কবুল করে রাখলাম।

আমি গিয়েছিলাম দেশ দেখতে। কথাটার তাৎপর্য সবাইকে উপলব্ধি করতে বলি। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ভারতবাসী রাশিয়া থেকে ঘুরে এসেছেন। কিন্তু কোনও-না-কোনও ভাবে তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই সেখানে সরকারী আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমরাই বোধ হয় প্রথম ট্যুরিস্ট-দল, গাঁটের পয়সা খরচ করে যাঁরা সেখানে বেড়াতে গিয়েছেন, থাকা-খাওয়ার বাবদে প্রতিটি পাই-পয়সা যাঁদের মিটিয়ে দিতে হয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের "ক্রেতা" বলে গণ্য করা যেতে পারে। "বিক্রেতা" অবশ্যই সোভিয়েট রাশিয়া। কথাটা খুলে বলবার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায়, যার ভিত্তিটা মূলত অর্থনৈতিক। যে-উদ্দেশ্যে নানান দেশের মায়েরা কিছুদিন আগে রাশিয়ায় "মাতৃ-সম্মেলন"-এ গিয়েছিলেন, তেমন কোনও মহান উদ্দেশ্য আমার ছিল না। শান্তি অথবা "গণতান্ত্রিক" ব্যবস্থা অথবা অন্য কিছুর জয়ধ্বনি দিতে আমি যাইনি। আমি গিয়েছিলাম নিছক ট্যুরিস্ট হিসেবে। সে-হিসেবে সম্পর্কটা ছিল নিতান্তই লেনদেনের। সোভিয়েট ইনট্যুরিস্ট ব্যুরো আমাদের দেখাশোনা করবার ভার নিয়েছিলেন। ইনট্যুরিস্ট ব্যুরো প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সেই কারণেই যদি কেউ বলতে চান যে,

কার্যত রাষ্ট্রীয় আতিথ্যই আমাদের স্বীকার করতে হয়েছিল ত সবিনয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, গোর্কি স্ট্রীটের ধারে যে আইসক্রীমের দোকানটি রয়েছে, অথবা তার বাঁদিকে যে খাবারের দোকানটি, অথবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে থেকে যে ট্যাক্সিটি আমাকে নিতে হয়েছিল, তার সবই ত সেখানে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। এবং যে-ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পো-রেশনের বিমানে করে আমাকে দিল্লী থেকে কাবুল যেতে হয়েছে, ফিরতি পথে কাবুল থেকে দিল্লী, তার মালিকও ত সরকারই। জোর করে যদি কেউ এখানে রাজনীতিকে টেনে আনতে চান, "রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই।" তার কারণ, আমিও এখানে রাজনীতি নিয়েই আলোচনা করতে বসেছি। কোনও বাধ্যবাধকতা অবশ্য আমার নেই। নেই, কেননা আমি সেখানে গিয়েছিলাম নিছক ট্যুরিস্ট হিসাবে। এবং এই একই কারণে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করবার অধিকারও আমার রয়েছে।

ভারত সরকারের সঙ্গেও আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। থাকলেও বিন্দুমাত্রই ছিল। তাঁদের কাছ থেকে শুধু এইটুকু স্বীকৃতি আমাকে নিতে হয়েছিল যে, আমার পাসপোর্ট নিয়ে আফগানিস্তান ও সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়া চলবে। এয়ারপোর্ট

থেকে হোটেল হ্যে কাবুলে যাওয়ার পথে জনৈক সঙ্গী আমাকে ভারতীয় দূতাবাসটি দেখিয়ে দিলেন। দূতাবাস অথবা তার বাসিন্দাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ এর চেয়ে বেশী আর এক-পাও এগোয়নি। মস্কোতে তাও না। ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক কর্মচারীর—যতদূর মনে পড়ে, ভদ্রলোকের পদবি ধর—সঙ্গে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই অবশ্য মিনিট কয়েকের জন্য আলাপ হয়েছিল। আমাদের দলেরই এক ভদ্রলোক তাঁর দূর-সম্পর্কে আত্মীয় হন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে তিনি ন্যাশনাল হোটেলে এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত ধরের চেহারাটা পর্যন্ত এখন আমার মনে নেই, তাঁর স্ত্রীর চেহারাও আমি বিস্মৃত হয়েছি। এর থেকে বুঝতে পারবেন, যোগাযোগটা সামান্য কালের। মস্কো থেকে যেদিন চলে আসি সেদিন ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির স্ত্রী শ্রীমতী আমিনা আমেদের কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছিলাম। কলকাতায় তাঁর দুই বন্ধু থাকেন, তাঁদের কাছে তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিতে হবে। বন্ধু দুজনের মধ্যে একজনের অবশ্য নামই তিনি মনে করতে পারলেন না। মস্কোতে যে-কদিন ছিলাম, ভারতীয় দূতাবাসের কেউ আমাদের একটা খবরও নেননি। তাতে আমাদের দলের দু-একজন ঈষৎ বিস্ময়বোধ করেছিলেন। ভারতীয় দূতাবাসের খরচ আসে ভারতবর্ষ থেকে। সেই ভারতবর্ষ থেকে প্রথম ট্যুরিস্ট-দল এসেছে,

অথচ দূতাবাসের কেউ একটা খবর পর্যন্ত নিল না, বিস্ময়টা নিশ্চয়ই অহেতুক নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য এই ঔদাসীন্যের পয়িচয় পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি। যদিও এতে বোঝা গেল না, মস্কোতে কে আসছে-যাচ্ছে, কী হচ্ছে-না-হচ্ছে, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীরা সে-বিষয়ে খুব সচেতন কিনা।

* * *

রাজনৈতিক বিচারে কী আমার পরিচয়? এই প্রশ্নটাকেই আর একটু ঘুরিয়ে উত্থাপন করা যেতে পারে। কী রকমের মন নিয়ে আমি আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম? অথবা রাশিয়ায়? বলে রাখি, কোনও ব্যাপারেই কোনও পূর্ব-সিদ্ধান্ত আমার ছিল না। কাবুলে গিয়ে একটি নিবিড় মৈত্রীর সান্নিধ্য উপভোগ করা যাবে, আমি আশা করেছিলাম। সেই মৈত্রীর খানিকটা পরিচয় যে আমি পাইনি, তাও নয়। ভেবেছিলাম যে, রাশিয়ায় গিয়ে শক্তির ক্ষেত্রে ক্রমাগ্রসর একটি রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। এমন নয় যে পাইনি। এককালে এদেশের কোনও কোনও মহলে আমি "কমিউনিস্টবিরোধী" আখ্যা পেয়েছি। কমিউ-

নিস্টদের পত্র-পত্রিকায় আমার বিভিন্ন বই সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করা হয়েছে, তাতে অন্তত সেই রকমেরই একটা ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে আবার জনৈক মার্কিন কূটনীতিবিদ্ আমাকে ডালেস-বিরোধী বলে গণ্য করেন। এবং বলে রাখা ভাল, আমেরিকা বলতে তিনি ডালেসকেই বোঝেন। এ-দুটি আখ্যার কোনওটিই আমার অর্জিত নয়। আসলে আমার জীবনে আদর্শবাদের ভূমিকা আদৌ মুখ্য নয়! সবকিছু নিয়েই আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী। মিঃ ডালেস অথবা মিঃ ক্রুশ্চেভ যে আমাকে বন্ধু বলে গণ্য করবেন, এমন আশা আমি করি না। উদারনীতির কিছু কিছু আদর্শের প্রতি আমার আনুগত্য আছে বটে, কিন্তু মুশকিল এই যে, এই সব আদর্শের কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই।

আমি যে আফগানিস্তান এবং রাশিয়ায় গিয়েছিলাম, সে শুধু দেশ দেখতে। আর কোনও উদ্দেশ্য কি ছিল না? ছিল। ভেবেছিলাম যে ফিরে এসে ভারতবাসীদের কাছে এ-দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটা মোটামুটি পরিচয় পেশ করব। একটি রাষ্ট্র দুর্বল, এবং ভারতবর্ষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। অন্যটিও আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র; একটি বিশাল শক্তিশালী

রাষ্ট্রের পক্ষে যে-রকমের মিত্র হওয়া সম্ভব। দারিদ্র্য-সমস্যার পরিচয় পেতে আমি ব্যগ্র ছিলাম; স্বাধীনতার পরিচয় পেতেও আমার আগ্রহ ছিল। বরাবরই আমি সচেতন ছিলাম যে আফগানিস্তানের তুলনায় ভারতবর্ষের শক্তি অনেক বেশী। এবং রাশিয়ার তুলনায় আমাদের শক্তি অনেক কম। ভারত-আফগান এবং ভারত-রুশ সম্পর্কের উপর এই তারতম্যের প্রভাব যে কতখানি তাও আমি জানতাম। দুটি দেশের সঙ্গে আমাদের দু' রকমের সম্পর্ক-পার্থক্যটাকে আমি বুঝতে চেয়েছিলাম। বিশেষ কোনও আদর্শবাদ সম্পর্কে অনাবশ্যক আগ্রহ আমার ছিল না। অনাবশ্যক অনীহাও না। এখনও নেই। আগেই বলেছি, আমি নিরপেক্ষ।

পুনশ্চঃ ইনট্যুরিস্ট ব্যুরো থেকে আমাদের একটি মীল-কুপনের বই দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ায় এসে কার কেমন লাগল, সে-সম্পর্কে শেষের পাতায় অভিমত আহ্বান করা হয়েছে। একজন বড় চমকপ্রদ অভিমত দিয়েছেন দেখলাম। তিনি লিখেছেন, "প্রেজুডিস নিয়ে এসেছিলাম, খোলা মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।" খোলা মন নিয়ে আমি যাইনি, খোলা মন নিয়ে ফিরেও আসিনি। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া ভাল, আমি আমার নিজের

মন নিয়ে গিয়েছিলাম। যে-মন নিয়ে ফিরে এসেছি, সেটাও নিঃসন্দেহে আমার নিজের।

ভারতবর্ষের মর্যাদা

যাত্রাপথে কাবুলে আমি একদিন ছিলাম। সেই একটি দিনে বেশ-কিছু আনন্দ, এবং অল্প-কিছু শিক্ষা, আমি আহরণ করেছি। মোটামুটিভাবে আমার অভিজ্ঞতা এখানে বিবৃত করব। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষের কথাও এখানে উঠতে পারে।

যাঁরা আমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা নানান মর্জির মানুষ। তাঁদের সান্নিধ্য যে সব সময়েই আমার আনন্দের হেতু হয়েছে, এমন কথাও বলতে পারিনে। কাবুলকে তবু ভাল লেগেছিল। দিনমানে ঈষৎ গরম ভোগ করেছি, রাত্রে শীত-শীত ঠাণ্ডা পড়ল। কাবুল নগরকে মনোরম বলা যায় না, তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তার আপাতরুক্ষতার মধ্যেও একটি দুর্লভ সৌন্দর্য রয়েছে। চারদিকে পাহাড়। আমি বাংলা দেশের মানুষ। মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে—সুদূরে কোনও গ্রাম হয়ত দেখা যায়, কিন্তু পাহাড় দেখা যায় না। সমতলভূমির সেই একই চেহারা দেখে-দেখে চোখ হয়ত ক্লান্ত হয়ে থাকবে, কাবুলের অফুরন্ত শৈলমালাকে তাই প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছে। প্রচণ্ড ধুলো, অসংখ্য মাছি (না চাহিলে শুধু এই দুটি জিনিসই কাবুলে

পাওয়া যায়) ; তা হুক, মানুষজনের স্বাস্থ্য তবু ভাল, চেহারাও (ইয়ান স্টিফেন্সের বর্ণনাতেও এর সমর্থন রয়েছে) সুন্দর। এতই সুন্দর যে, কারো-কারো গায়ের উৎকট গন্ধকেও সাময়িকভাবে বিস্মৃত হওয়া যায়। আফগানিস্তান পর্দানশিন দেশ। সুতরাং আফগান-নারীর দেহলাবণ্য সম্পর্কে কোনও রায় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শুনেছি, আফগান মেয়েরা নাকি পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধি রাখেন ; এবং দৃষ্টিকে যদি কেউ বোরখাভেদী করে তুলতে পারেন (আমার বিবেচনায় যা কি না একান্তই অসম্ভব), তবে সজ্জাবিন্যাসে যে-আধুনিকতম রুচির তিনি পরিচয় পাবেন, তার মূল্য বোঝা একমাত্র প্যারিস অথবা নিউ ইয়র্কের পক্ষেই সম্ভব। এ সবই অবশ্য আমার শোনা-কথা। আগেই তা আমি কবুল করেছি।

প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের কথাই যদি উঠল, তা হলে বলি, এ দুটি শহরের সঙ্গে কাবুলের পার্থক্য প্রায় মেরুপ্রতিম। মধ্য-প্রাচ্যের কোনও রাজধানীর চেহারা যদি আপনি দেখে থাকেন, একমাত্র তা হলেই হয়ত কাবুলের একটা আন্দাজ আপনি পেয়ে যাবেন। দরিদ্র, অপরিচ্ছন্ন জায়গা, স্বাধীনতার জন্য অসম্ভব গর্বিত, কিন্তু নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়, এই হল কাবুল। মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়, আপন

অবস্থায় ঈষৎ উন্নতি যে নিতান্ত অসম্ভব ছিল না, সেই বোধ পর্যন্ত এদের নেই। ক্রোধের সঙ্গে নয়, বেদনার সঙ্গেই এ-কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। ক্রোধের সঙ্গে নয়, কেননা আফগানিস্তান আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র। বেদনার সঙ্গে, কেননা ভারতবাসীমাত্রেই কামনা করে যে, জগৎসভায় আফগানিস্তান তার প্রাপ্য সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হক। "আমি ভারতবাসী" —বহির্ভারতে শুধু এইটুকুমাত্র পরিচয় দিয়েই যদি কেউ রাজকীয় খাতির পেতে চান, তাঁকে আমি আফগানিস্তানে যাবার পরামর্শ দেব। ভারতীয় মুদ্রার এখানে অসম্ভব সম্মান। এক টাকায় চার অথবা পাঁচ আফগানি, মোটামুটি এই হল গিয়ে বিনিময়ের হার। কিন্তু তা কেউ মেনে চলে না। কাবুলে এসে নিকটতম চায়ের দোকানে গিয়ে পরীক্ষা করুন, অক্লেশে আপনি এক টাকায় দশ থেকে পনর আফগানি পেয়ে যাবেন এবং বলাই বাহুল্য, যেহেতু আপনি ভারতবাসী, এখানে এসে দেখবেন যে, সবাই আপনার আত্মজন। ব্যাপার দেখে কার না আনন্দ হয়। আপনারও হবে। তার কারণ শুধু এই নয় যে, আফগানিস্তান আমাদের মিত্র-রাষ্ট্র। আরও একটা কারণ আছে। যে-পাকিস্তান আমাদের নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না, আফগানিস্তান তাকে ঘৃণা করে।

আফগানিস্তানের সঙ্গে সমুদ্রের কোনও যোগ নেই। কে যে এ-দেশে ক্ষমতাশালী, কে যে নয়, বোঝা বড় কঠিন। শুনেছি, প্রধানমন্ত্রী নাকি উদারপন্থী মানুষ, কিছু-কিছু সংস্কারসাধনও তিনি করতে চান। তবে তাড়াতাড়ি নয়, ধীরেসুস্থে। ধর্মীয় ব্যাপারে মোল্লাদের এখনও উপেক্ষা করবার উপায় নেই, এবং দেশের প্রায় সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গেই তাঁরা, কোনও-না-কোনও ভাবে ধর্মীয় যোগসাধনের পক্ষপাতী। তা ছাড়া একটি সামন্ত-শ্রেণীও এখানে আছে। এদেরও একেবারে দুর্বল বলা যায় না। সামন্তশ্রেণীর শাখাপ্রশাখা সম্পর্কপরম্পরায় এতই দূরপ্রসারী যে, তার পরিচয় পেয়ে অনেক সময় কৌতুক বোধ করতে হয়। আফগানিস্তানে এমন দু-একজন টিকিট-কলেক্টর আমি দেখেছি, পাঁচ-দশ পুরুষ উজিয়ে গিয়ে কোনও উজির-ওমরাহের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যেতে পারে। রক্তের রং এখন অনেক ফিকে হয়ে এসেছে, তবু "ইয়োর এক্সেলেন্সি" না বললে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। সে যা-ই হক, যে-তিনটি শক্তি-শালী শ্রেণীর আমি উল্লেখ করেছি, কী করে যে তাদের মধ্যে ভারসম্য বজায় রাখা হয়েছে, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় সেটা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। আগেই বলেছি, কাবুলে প্রথমে মাত্র ২৪ ঘণ্টাই আমি ছিলাম। একটা ব্যাখ্যা অবশ্য এখুনি দিতে পারা যায়।

প্রকৃত অর্থে হয়ত এরা আদৌ শক্তিশালী নয়। হয়ত এদের বিন্দুমাত্রও গতিশক্তি নেই। দুটি বস্তুর মধ্যে অন্তত একটি যদি জঙ্গম হয়, তবেই তাদের মধ্যে একটা সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কা থাকে। যে যার নিজের জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে থাকলে, থাকে না। আমি ছিলাম চলন্ত অবস্থায়। অন্তত সেই কারণেও আফগানিস্তানকে আমার জঙ্গম বলে মনে হওয়া উচিত ছিল, ট্রেনের জানলা থেকে বাইরের গাছপালাকে যেমন মনে হয়। আফগানিস্তানের বেলায় তাও আমার মনে হয়নি। এবং সবটাই হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম নয়।

এত কথা বলার পরে আরও একটি কথা যোগ করা দরকার। একটু সচেষ্ট হলেই আফগানরা তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পারে। আমি ছিলাম কাবুল হোটেলে। হোটেলের পরিবেশ দেখে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, এই পটভূমিকায় গ্রেহাম গ্রীন অনায়াসে একখানি উপন্যাস লিখতে পারতেন। তবে বলাই বাহুল্য, জনৈক ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সাহিত্যের পটভূমি হওয়াটাই কিছু আফগানিস্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। তা যদি না হয়, আর কোনও মহৎ উদ্দেশ্য যদি তার থাকে, তবে আফগানদের তার জন্য আরও খানিকটা সচেষ্ট হতে হবে। নয়ত বহির্জগতে তার বিশেষ-কিছু পাত্তা পাবার আশু

কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রথমেই তাদের বুঝতে হবে যে, ভূমণ্ডলে আফগানিস্তানই একমাত্র দেশ নয়, তার বাইরে আরও অনেক দেশ আছে। লেনিনগ্রাদে থাকতে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। রাশিয়ার প্রথম বাণিজ্য-বন্দর এই লেনিনগ্রাদ। পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে রাশিয়ার যোগসাধনের জন্য পিটার দি গ্রেট এই বন্দরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরও দূরপ্রসারী। রুশ দেশে তিনি আধুনিক জীবন-ধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কম্যুনিস্টরাও সেই নবীকরণের সাধনা থেকে বিচ্যুত হয় নি। লেনিনগ্রাদে বসে আফগানিস্তানের কথা আমার মনে পড়ল। বহির্বিশ্বের আহ্বানে সে সাড়া দেয়নি, অন্ধ অহঙ্কারে সে দূরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এর চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, আফগানিস্তানে বেশ-কিছু খনিজ সম্পদ পাওয়া যেতে পারে। মাটি খুঁড়ে কে সেই সম্পদকে উদ্ধার করবে? আফগানরা? বর্তমান অবস্থায় তেমন কোনও চেষ্টা করাও তাদের সাধ্যের বহির্ভূত। নিজেরা যদি না পারে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে নিলেই ত হয়। তাও তারা আনবে না। আর-একটা ব্যাপারেও তারা গুরুত্ব অর্জন করতে পারত। বিমান চলাচলের ব্যাপারে। কাবুলকে মধ্যবিন্দু করে আজ যদি দিল্লী আর মস্কোর মধ্যে নিয়মিত বিমান-পরিবহনের ব্যবস্থা হয়, অথবা পশ্চিম ইউরোপ

আর এশিয়ার মধ্যে (ঘুরপথে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবার কোনও দরকারই তা হলে হয় না), ত [illegible] কাবুলের গুরুত্ব প্রায় তিন গুণ বেড়ে যাবে। আদিকালের আর্যরা যে কোন্ পথে কোথায় গিয়েছিলেন, তা নিয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলবার উপায় নেই। তবে যাত্রাপথে কাবুল যে তাঁদের একটা বড়-রকমের ঘাটি ছিল, তাতে সন্দেহ করিনে। আবারও সে সেই সম্মানকে ফিরিয়ে পেতে পারে, যদি অবশ্য প্যান অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজ আর এয়ারোফ্লট কাবুলকে তাঁদের সংযোগ-বিন্দু করতে সম্মত হন। সম্মত না হবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই এবং তেমন একটা চেষ্টাও নাকি চলছে। কাবুলের আর কিছুই করতে হবে না। তাকে শুধু মনঃস্থির করতে হবে। সম্মতিদান করলেই সে আজ প্রসারশীল কয়েকটি সভ্যতার মিলনতীর্থে পরিণত হতে পারে। আসা-যাওয়ার পথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, নতুন একটি সভ্যতাকে গড়ে তোলাও তার পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। এ-সবই তার পক্ষে সম্ভব। অবশ্য অনায়াসে নয়। কেননা প্রচণ্ড একটা বিঘ্নও তার রয়েছে।

*　　　*　　　*

আফগানিস্তানের জাতীয় জীবনে যার শক্তি আজ সবচাইতে বেশী, চর্মচক্ষে তাকে দেখা যাবে না, কিন্তু তাই বলেই তার অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সে হল আমানুল্লার ভূত। এক পা এগোতে গিয়ে আফগানিস্তানকে যে আজ তিন বার ভাবতে হয়, তার একমাত্র কারণ এই যে, আমানুল্লা পরিণামকে সে আজও ভুলতে পারেনি। বিপ্লববাদ নিয়ে যাঁর পড়াশুনো করেছেন, আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত থেকে তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষা আহরণ করতে পারেন। আফগানিস্তানের যে-কোন কর্তা-ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা কয়ে দেখবেন ; দু মিনিটে তিনি আপনাকে জানিয়ে দেবেন যে, শুধু পর্দাপ্রথা কেন, আপন দেশের অনেক কিছু সম্পর্কেই তাঁর প্রবল আপত্তি বর্তমান এতই যদি আপত্তি, ত কিছু-একটা করা হচ্ছে না কেন? কারণটা আর কিছুই নয়, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ কেরানীটি পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে আছেন, কিছু একটা করতে গেলেই হয়ত তাঁদেরও শেষে আমানুল্লার দশা ঘটবে। অনেকে ভাবেন, "ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছিয়ে যায়, সমুদ্র এইভাবেই অগ্রসর হয়।" হয়ত হয়, তবে সর্বক্ষেত্রে হয় না। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে হয়নি। আমানুল্লা তাঁর দেশকে তড়ি-ঘড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তার ফলে ঘড়ির কাঁটা সেখানে আজ বড্ড বেশী পিছিয়ে গিয়েছে। তার চাইতেও

আক্ষেপের কথা, সে-কাঁটা আর এগোতেই চাইছে না। আমানুল্লা কি বড্ডই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ফেলেছিলেন। চুলচেরা বিতর্কের প্রয়োজন নেই। ইতিহাস শুধু এইটুকুই লিখে রেখেছে যে, দেশকে তিনি তাঁর সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। এবং তার ফল হয়েছে এই যে, পরবর্তীকালের সংস্কারকরা সবাই তটস্থ হয়ে আছেন। শ্রীনেহরু ধীরে-সুস্থে চলবার পক্ষপাতী। অতীতে এ নিয়ে আমি তাঁর কিছু সমালোচনা করেছি। কাবুলে গিয়ে আমাকে আবার ভাবতে হল। যে-সব সংস্কার সাধনের আশু প্রয়োজন ছিল, শ্রীনেহরু সেগুলিকে সাময়িকভাবে পিছিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন, না প্রচণ্ডতর প্রতিক্রিয়া আর অন্ধ গোঁড়ামির হাত থেকে তাঁর দেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন? এ নিয়ে আর জোর গলায় কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আফগানিস্তান আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। দেখে আমি খুশী হয়েছি। বন্ধুতা আমি ভালবাসি। তবে আমার অধিকাংশ বন্ধুই অক্ষম। কারও উপকার করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। অপকার করবার শক্তি থাকলেও আমি খুশী হতুম। তেমন বন্ধুতেই আমার অভিরুচি। ফর্স্টার যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন, একটা দেশের পররাষ্ট্র নীতি তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে কি না, হওয়া উচিত কি না, সঙ্গত কারণেই

তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। যাদের আমরা কলম্বো-শক্তি বলে আখ্যা দিয়েছি, কে তাদের মধ্যে শক্তিশালী? আর বান্দুং সম্মেলনের কথাই যদি ওঠে ত বলব, সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি কি চারটি দেশ ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির উপরে আস্থা রাখে। ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং হয়ত, সিংহল! এদের মধ্যে কাউকেই "শক্তি" আখ্যা দেওয়া যায় না। "শক্তি" কথাটার প্রকৃত অর্থে। জার্মানি ছিল শক্তিশালী দেশ। তাই ইতালির মত অপদার্থকেও মিত্র বলে গ্রহণ করবার বিলাস তাকে মানিয়ে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী দেশ। তাই ফরমোজা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম অথবা পর্তুগালের মত অক্ষম দেশকেও বন্ধু বলে গ্রহণ করা তার সাজে। তাই বলে কি ভারতবর্ষেরও সাজে? উত্তরটা আমার জানা নেই। কাবুলের পাঘমান বাগিচায় বসে এই সব কথাই আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, ভারতবর্ষ হয়ত এমন সব দেশকেই তার বন্ধু বলে গ্রহণ করবার অভ্যাস আয়ত্ত করেছে, ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্র উপকার সাধনের ক্ষমতা যাদের নেই, এবং ভারতবর্ষের কাছ থেকে তেমন-কিছু উপকার পাবার সম্ভাবনাও যাদের আশু নয়। সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকায় পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ খানিকটা সুবিধে করে নিয়েছে সন্দেহ নেই, এবং শ্রীনেহরুকে

তার জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদও আমরা জানাব। কিন্তু এ সব লাভ নিতান্তই দৈব। দৈবের উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নয়। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষের এবারে একটা স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করা দরকার। বিশেষ করে এইজন্য যে, আফগানিস্তানই ভারতের একমাত্র মিত্ররাষ্ট্র নয়, যার মিত্রতার মূল্য সম্পর্কে তার নির্মোহ হওয়া প্রয়োজন।

আফগানিস্তান ঃ পুনশ্চ

কথা ছিল ফিরতি পথেও আফগানিস্তানে আমাকে একটি দিনই থাকতে হবে। কার্যত তিনদিন ছিলাম। সেটা কোনক্রমেই সম্ভব হত না, যদি না ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স কর্পোরেশনের পরিবহন-ব্যবস্থায় সময়-সংক্রান্ত একটা গোলযোগ ঘটত। এয়ারোফ্লট যেদিন আমাকে কাবুলে পৌঁছে দেন, তার পরদিনই আমার আই-এ-সির বিমানে উঠবার কথা। সে-বিমান তিন দিনের আগে পাওয়া যায় নি। আফগান সরকার আমার পাসপোর্টের পাঁচ-পাঁচটি শূন্য পৃষ্ঠা পূরণ করে দিয়েছেন। বিনিময়ে, আফগানি-স্তানের উপরে এই আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে যা লিখেছি, এখানে তার কোনও সংশোধন করতে আমি বসিনি। এটিকে বরং প্রথমটির পরিপূরক বলে গণ্য করা যেতে পারে। এবং ব্যাপারটা আমার পক্ষে অবিমিশ্র আনন্দের নয়। আগের প্রবন্ধে যদি কেউ কিঞ্চিৎ অশান্তির ইঙ্গিত খুঁজে পেয়ে থাকেন, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধপাঠে তিনি আরও বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন। কাবুলে থাকতে বাবুর শা'র সমাধি আমি দেখেছিলাম। আমি ঐতিহাসিক নই। তবুও, বাবুরের মৃত্যুর পরবর্তী কালে ভারত-বর্ষে যা-যা ঘটেছে সে-বিষয়ে চিন্তা না করে আমি পারিনি।

কাবুলের চারপাশের শৈলমালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বতই আমার মনে হয়েছে যে, ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-নীতির মধ্যে —আর যা-ই থাক— ঐ পাথুরে দৃঢ়তা নেই। প্রসঙ্গত বলে রাখি, শ্রী নেহরুর পররাষ্ট্র-নীতিকে আমি শুধুই আদর্শ-ভিত্তিক বলে মনে করি না, আমি জানি যে, তার ভিত্তির মধ্যে বাস্তব বোধেরও পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই বাস্তবতা পাথরের মতই দৃঢ়। তবুও আক্ষেপ করতে হয়। এই কারণে যে, সেই দৃঢ়তার সীমারেখা দূরবিস্তৃত নয়। এই কারণে যে, সেই দৃঢ়তার প্রকৃতি আমাদের অপরিজ্ঞাত। এই কারণে যে, তার কোথায় কতখানি আমরা নির্ভর করতে পারি, তাও আমাদের স্পষ্ট জানা নেই। প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলা দরকার। আফগান সরকারের মৈত্রী লাভের জন্য ভারত সরকার যা-কিছু করেছেন, তা অত্যন্তই যুক্তিসঙ্গত। মৈত্রী অর্জনে তাঁরা সক্ষমও হয়েছেন। এই সাফল্যের মূল্য কম নয়।

কাজটা অবশ্য সহজসাধ্য হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। যতদূর জানি আফগানিস্তানে সম্প্রতি আদমশুমারি হয়নি। না হক, আফগান জনসাধারণের অধিকাংশই যে মুসলমান, সকলেই তা জানেন। আফগানিস্তানের মোট লোকসংখ্যা এক কোটি কুড়ি লক্ষ। তার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হাজার তিন-চারের বেশী নয়।

ক্রীশ্চান কেউ আছেন কি না জানিনে। না থাকাই সম্ভব এখন। কেউ যদি বলেন যে, আফগানদের সহানুভূতি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের দিকে না গিয়ে ঐস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে আশা করি, তাঁকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী আখ্যা দেওয়া হবে না ; বস্তুত, সাম্প্রদায়িকতাবাদী না হয়েও এমন উক্তি করা যেতে পারে। মুসলমানদের সহানুভূতি স্বভাবতই কোন্ দিকে ধাবিত হয়ে থাকে, ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। ইসলামের জন্ম এবং বিকাশ যে-ভাবে হয়েছে, হিন্দু-ধর্মেরও যদি সেইভাবেই জন্ম এবং বিকাশ হত, তবে হিন্দুদের আচরণেও হয়ত সবিশেষ পার্থক্য দেখা যেত না। (এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়, তথ্যের বিবৃতি মাত্র।) তার উপরে, আফগান-মানসের স্বাভাবিক প্রবণতাকে আরও উৎসাহিত করে তুলবার জন্য রয়েছে পাকিস্তানী প্রচারকার্য। আফগানিস্তানে ইংরেজী সংবাদপত্র নেই। যে-কটি ফারসী সংবাদপত্র রয়েছে, সরকারী নির্দেশে সেগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে। বিদেশী আগন্তুককে তাই বাধ্য হয়েই বিভিন্ন দূতাবাস থেকে প্রচারিত দৈনিক বুলেটিনের উপর নির্ভর করতে হয়। পাকিস্তানী বুলে-টিনের একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এর থেকেই পাকিস্তানী প্রচারের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। "হিন্দুরা আজ ইসলামকে সমূলে উৎখাত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। নিপীড়িত

ভারতীয় মুসলমানদের এই সঙ্কটকালে, রাজা সৌদ এবং প্রেসিডেণ্ট নাসের তাদের সাহায্য করবেন এবং হিন্দুদের প্রতিহিংসা থেকে তাদের বাঁচাবেন, জাতীয় পুনর্গঠন আন্দোলন এইটেই আশা করেছিল।” অর্ধশিক্ষিত যে-সব আফগান কিছু কিছু ইংরেজী পড়ে থাকে, যদি মনে করি যে, তাদের উপরে এই ধরনের নোংরা প্রচারকার্যের কোনও প্রভাব পড়া সম্ভব নয়, ত তাতে আত্ম-প্রবঞ্চনাই করা হবে। এই সব লেখা তারা পড়ে, এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এ-সব কথা প্রচার করেও বেড়ায়।

*　　　*　　　*

ভারতবর্ষ আজ আফগানিস্তানে যা-কিছু করছে, তা অত্যন্তই যুক্তিসঙ্গত। ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির মূল তত্ত্বটিকে যদি আমি বুঝতে পেরে থাকি, তবে তা হল এই যে, ভারতবর্ষ আজ প্রতিটি রাষ্ট্রেরই মৈত্রী আকাঙ্ক্ষা করে। আফগানিস্তানেরও। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়া ও চীন, একদিকে বিরাট এই দুটি রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী স্থানে যতগুলি সম্ভব নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন এবং তাদের নিরপেক্ষতাকে বাঁচিয়ে রাখাও

বোধ হয় ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য, যদিও সে-কথা কোথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এই রকমেরই একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল আফগানিস্তান। পাকিস্তান নামেমাত্র বান্দুং-গোষ্ঠীর সদস্য; বান্দুংয়ে ঘোষিত আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য তার নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রতিও বরাবরই সে শত্রুভাবাপন্ন। অন্যান্য কারণ ত আছেই, এই কারণেও আফগানিস্তানের বন্ধুতাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। খুবই ভাল কথা। কিন্তু তারপরেই একটা প্রশ্ন উঠবে। আফগান সরকার এবং সম্ভবত ভারতীয় পররাষ্ট্র-দপ্তর (একটু আগেই যার আমরা প্রভূত প্রশংসা করেছি) ক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কিন্তু প্রশ্নটা তবু না তুলে উপায় নেই। আফগান সরকার এবং আফগান জনসাধারণের মধ্যে যেটুকু সদ্ভাব আছে বলেই মেনে নেওয়া উচিত, সত্যিই কি তা আছে? আবার বলি, আফগানিস্তান সম্পর্কে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-নীতির কোনও পরিবর্তন কেউ দাবি করছেন না। যে-নীতি এখন চালু আছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সেই নীতিই হয়ত সর্বোত্তম। কাবুল সরকারের মিত্রতাকে বাঁচিয়ে রাখা হক, কাবুল-সরকারের চরিত্র-বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই। আর তা ছাড়া, একটা বিদেশী সরকার তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেনই বা কেন।

সরকারের কর্তব্য এবং সাংবাদিকের. কর্তব্য তাই বলে সমার্থক নয়। কর্তব্য নির্ধারণে সরকারের সঙ্গে জনৈক সাংবাদিকের যদি ঈষৎ মতানৈক্য ঘটে, তাঁকে ক্ষমা করতে হবে। কূটনৈতিক বিধিনিষেধের আওতায় তিনি পড়েন না। শুধু তাই নয়, সরকারের তরফে তিনি কথা বলছেন না, বলছেন তাঁর নিজের তরফে। তাঁর কাছ থেকেও বিনয় আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ততক্ষণই, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনয়ের সঙ্গে সত্যের সঙ্ঘর্ষ ঘটছে। একটা তুলনা দেই। চেম্বারলেনের আমলে ব্রিটেনের যে-সব সংবাদদাতা বার্লিনে ছিলেন, আপনাপন কাগজে তাঁরা হিটলার সম্পর্কে খাঁটি খবরই পাঠাতেন। কিন্তু চেম্বারলেন-সরকারের প্রতি অপ্রশ্ন আনুগত্যের দরুন সম্পাদকরা তা ছাপাতেন না। সম্পাদকদের তুলনায় এইসব সংবাদদাতার দেশপ্রেম কি তাই বলে কিছু কম ছিল? আমার তা মনে হয় না। সাংবাদিকতার নৈতিক দিকটির কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। তারপরেও একটা কথা থাকে। যে-কোনও দেশের শাসক-সম্প্রদায়কে তার আপাত-অবস্থায় মেনে নেওয়াটাই হল বৈদেশিক সরকারের কর্তব্য। কিন্তু সাংবাদিকদের কর্তব্য তা নয়। সেই শাসক-সম্প্রদায়ের চরিত্র তাঁকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আফগানিস্তানের বর্তমান সরকারের চরিত্রে নানাবিধ ত্রুটি বর্তমান। পরের

কথাগুলি নিশ্চয়ই ভারত সরকারের অজানা নয়। কিন্তু জানাতে তাঁরা অক্ষম। জনসাধারণকে তাই বলে অন্ধকারে রেখে দেবার কোনও মানে হয় না। সরকার যে-কথা জানতে পারেন না, সাংবাদিককেই তা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ভারতীয় এক-আনিতে যেটুকু সোনা আছে, আফগানিস্তানে গণতন্ত্রের পরিমাণ ঠিক ততটুকুই। সাহারা মরুভূমিতে যতখানি বৃষ্টিপাত হয়, আফগান জনসাধারণের ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের পরিমাণ তার চাইতে বেশী নয়। এবং আইসল্যাণ্ডে হয়ত বা সাপ থাকতে পারে, আফগানিস্তানে গিয়ে কেউ ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামগন্ধও খুঁজে পাবেন না। ফ্রান্সের বুর্বঁ রাজবংশ উদারনৈতিকতার আদর্শে যতখানি আস্থাশীল ছিলেন, কাবুল সরকারের আস্থা, এ-বিষয়ে, ঠিক ততখানিই। জন-জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই সেখানে সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আফগান সরকারের অকুণ্ঠ সমালোচনা যদি কেউ শুনতে চান, অবশ্যই তাকে ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবে যেতে হবে। উপরি লাভও কিছু হতে পারে। গোটা দেশে কড়া প্রহিবিশন,

বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মচারীরা তাই ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবে গিয়ে জমায়েত হন। যাঁদের আপত্তি নেই, সেই সব আফগানও সেখানে আসেন; এখানে তাদের মুখ খুলে যায়। আপন দেশের সরকার সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য তাঁরা করেন, তা শুনে আফগান সরকার যে লজ্জায় অধোবদন হবেন, এমন আশঙ্কা অবশ্য করিনে। দু-একটা ভাল কথাও কি তারা বলেন না? অবশ্যই বলেন। কে একটা ভাল চাকরি পেয়েছে, জলপানি দিয়ে কাকে বিদেশে পড়তে পাঠানো হয়েছে, সে-সব খবরও তাঁরা শুনিয়ে থাকেন। সেইসঙ্গে একটা "পুনশ্চ" জুড়ে দেন। বলেন যে, চাকরিটা যাকে দেওয়া হয়েছে, সে হল অমুক মন্ত্রীর তমুক ভাইপোর প্রথম পক্ষের ছোট ছেলে; আর হ্যা জলপানি দিয়ে যাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, সে হল গিয়ে রাজামশাইয়ের পিসতুত ভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের খুড়তুত ভাই। শুধু তা-ই নয়, চাকরি অথবা জলপানি বণ্টনের ব্যাপারে যোগ্যতা বিচার করে দেখা দরকার, এমন সব অদ্ভুত কথাও এঁরা বলে থাকেন। ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবে যদি যান, এঁদের মুখে নানান রকমের দুর্নীতির খবর আপনি পাবেন। এবং তার সবগুলিই হয়ত মিথ্যা মনে হবে না। তাই বলে যে এঁরা মোল্লাদের অনুরক্ত এমনও নয়। এঁদের ধারণা, সরকারের প্রতি মোল্লাদের যতটা আনুগত্য রয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি ততটা নেই। আর

জনসাধারণের প্রতি আনুগত্যের ত কোনও কথাই ওঠে না। আপনি অবশ্য প্রশ্ন করবেন, অবস্থা যদি এতই খরাপ হয়ে থাকে ত তার প্রতিবিধানের জন্য কিছু একটা করা হচ্ছে না কেন। সে-প্রশ্নের উত্তরে একটু লক্ষ্য করলেই আপনি দেখতে পাবেন যে, একজোড়া আফগান-চক্ষুতে ক্রোধের আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবে এমন কিছু আশাবাদীর সঙ্গেও আপনার পরিচয় হতে পারে, সত্যিই যারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বিতীয় আমানুল্লার আবির্ভাব ঘটতে আর দেরি নেই; তফাতটা শুধু এই যে, এবারে আর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। কে জানে, বোরখার অন্তরালেও হয়ত অশান্তির আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

বৈদেশিক সরকারমাত্রকেই আজ দায়ুদ-সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। কিন্তু কতখানি দৃঢ় তার বনিয়াদ, অনেকের মনেই তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। স্বপ্নবিলাসী মানুষ আমি নই। আমি জানি যে, দীর্ঘকাল ধরেই জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে। আর তা ছাড়া, আফগানিস্তানের শাসনভার কী রকমের সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত, আফগানরাই তা নিয়ে মাথা ঘামাক। আমি শুধু একটি কথাই বলতে পারি। কাবুল থেকে এই ধারণা নিয়ে

আমাকে ফিরতে হয়েছে যে, যে-সরকারের উপরে জনসাধারণের আস্থা নেই, তার প্রতি অতিরিক্ত বন্ধুতা দেখিয়ে কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আফগান জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছে। বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র জার্মানরাই দেখলাম আফগান জনসাধারণের ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছে। রাশিয়ানরা সেখানে মহা উৎসাহে রাস্তাঘাট বানিয়ে দিচ্ছে, আমেরিকানরা বাঁধ নির্মাণে হাত দিয়েছে, কিন্তু এত সব করেও তারা আফগানদের ভালবাসা পায়নি। আফগানিস্তানে এমন অনেক মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, যাঁরা জার্মানি যেতে চান। একজনের কথা মনে পড়ছে, তিনি মস্কো দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন। আর একজন যেতে চেয়েছিলেন নিউইয়র্কে। নয়াদিল্লীর নামোল্লেখ কেউ করেননি। কেন করেননি? প্রশ্নটা অত্যন্তই জরুরী। কিন্তু তার উত্তর জেনে নেবার আগেই আমাকে কাবুল ত্যাগ করতে হল।

একটি লেখা ঃ ৬00 রুব্‌ল

কমিউনিজ্‌ম্ ও সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে আপন অভিমত জানিয়ে তার কুড়ি বছর বাদে কোনও লেখক যদি সেই একই অভিমতকে আবার জনসমক্ষে পেশ করতে পারেন, ত নিঃসন্দেহেই সেটা তাঁর সংসাহসের পরিচায়ক হবে। শুধুই সৎসাহসের নয়, আরও দু-একটি গুণের। এবং এরই দরুন বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং এডমণ্ড উইলসন সম্প্রতি আমাদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। সমালোচনার এটি একটি উত্তম মানদণ্ড, তাতে সন্দেহ করিনে। আমি অবশ্য ততখানি সাহসের পরীক্ষা দিতে বসিনি। সোভিয়েট রাশিয়ায় থাকতে সে-দেশ সম্পর্কে যে-অভিমত আমি জানিয়েছি, ভারতীয় পাঠকের কাছেও—এই নিবন্ধের মাধ্যমে—সেই একই অভিমত আমি পেশ করব। লেনিনগ্রাদ ত্যাগ করবার মাত্রই ঘণ্টা-কয়েক আগে "মস্কো নিউজ"-এর জনৈকা মহিলা প্রতিনিধি আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন। সাংবাদিকতাই আমার বৃত্তি, এ-কথা জানবার পর তিনি অনুরোধ করলেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় এসে আমার যা মনে হয়েছে, তারই উপরে তাঁর কাগজে কিছু লিখতে হবে। আমি অসম্মত হইনি। লেনিন-

গ্রাদে বসেই দ্রুত একটি প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম।

দ্রুত লিখেছিলাম বটে, কিন্তু অনায়াসে লিখতে পারিনি। সেই সকালের কথা আমার আজও মনে আছে। সুন্দর সকাল। হোটেল অ্যাস্টোরিয়ার জানলা থেকে সমস্ত কিছুকেই সেদিন মনোরম দেখাচ্ছিল। কিন্তু, পরিবেশের সেই অকৃপণ দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও মনে আমার স্বস্তি ছিল না। আমার সেই প্রবন্ধ আমি একটু বাদেই উদ্ধৃত করব। এবং তার রচনাভঙ্গির আড়ষ্টতা থেকেই লেখকের মানসিক অস্বস্তির খানিকটা আন্দাজ আপনারা পেয়ে যাবেন। সত্যি বলতে কি, আমার মনে খানিকটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই ভেবে যে, আমার প্রবন্ধে হয়ত বড্ড বেশী স্পষ্টভাষণ ঘটবে। তার চাইতেও আশঙ্কার কথা, হয়ত শুধু আমার তরফেই ঘটবে না। রাশিয়ায় এসে সকলের কাছ থেকেই যে নিখুঁত আতিথেয়তা, যে সৌজন্যসুন্দর ব্যবহার আমি পেয়েছি, হয়ত তার সম্মান রক্ষা করতে পারব না ; দু-একটা নির্দয় স্পষ্টোক্তির হয়ত প্রয়োজন দেখা দেবে। শুধু আশঙ্কাই ছিল না। গরীয়সী একটি দীনতার বোধও আমার ছিল। ছিল, কেননা এক দরিদ্র দুর্বল দেশের মানুষ আমি, তৎসত্ত্বেও শক্তিশালী সফলকাম একটি দেশের সম্পর্কে আমার অভিমত প্রার্থনা করা হয়েছে। অকারণে আমি সঙ্কোচ বোধ করিনি। "মস্কো

নিউজ”-এ যথাসময়ে (অক্টোবর ১৩, ১৯৫৬) আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

“ভারতবর্ষ থেকে প্রথম ট্যুরিস্ট দল (প্রতিনিধি দল) মস্কো রওনা হবেন। খবর পেয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, ‘আমিই বা কেন যাব না ?’ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। তাই এসেছি। আমি সাংবাদিক। তাই, স্বর্গে গিয়েও আমাকে ধান ভানতে হয়। তাই, এই বিচিত্র দেশে এসে অবিমিশ্র আনন্দের মধ্য দিয়ে এই যে আমার সংক্ষিপ্ত অবসর আমি কাটিয়ে গেলাম, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপরে প্রবন্ধ লিখবার সময় এর কোনও প্রভাব যে আমার লেখার উপরে পড়বে না, এমন কথা আমি বলতে পারিনে। যদি বলি তাতে আত্মবঞ্চনার অপরাধ ঘটবে। আগামী কয়েক বছরে মানবজাতির (তার মধ্যে আমি আছি, আমার দেশবাসীরাও আছেন) ভাগ্যে কী ঘটবে না-ঘটবে, রাশিয়া এবং রাশিয়ার মানুষদের দ্বারাই অনেকাংশে তা নির্ধারিত হতে চলেছে। বস্তুত, সেই দেশ এবং সেই মানুষদের পরিচয় নিতেই আমি এসেছিলাম। ইতিমধ্যে তাসকেন্তের অল্প একটু, মস্কোর আরও খানিকটা, আর এই সুন্দর নগর লেনিনগ্রাদেরও ঈষৎ পরিচয় আমি পেয়েছি। যেটুকু দেখেছি,

তাকে যথেষ্ট বলা যায় না। কিন্তু তার থেকেই অনেকখানি ধারণা আমার হয়েছে। সেই ধারণাগুলির কিছু কিছু আমি রাখব, কিছু কিছু বর্জন করব। তাতে সময় লাগবে। আপাতত রাশিয়া সম্পর্কে—যার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় এই আমার প্রথম—খুচরো কিছু মতামত আমি জানাতে পারি। পরবর্তী কালে এইসব মতামতের যদি অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে, সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না।

"গোড়ার থেকেই শুরু করা যাক। দিল্লী থেকে আমরা কাবুলে এলাম। সেখানে এক আমেরিকান বাসএ চড়ে আমরা কাবুলের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে বেড়াই। আমি বসেছিলাম ড্রাইভারের দিকে পিঠ দিয়ে। চেয়ে দেখি, আমার ঠিক ডান দিকে বাসএর দেয়ালে একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। যন্ত্রটি কোথায় তৈরী, পড়ে দেখবার কোনও প্রয়োজন আমার ছিল না। তবু পড়েছি। রাশিয়া তার নির্মাতা। এমন কিছু অবাক হবার মত ব্যাপার নয়। আর-পাঁচটা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র যেমন হয়ে থাকে, এটিও ঠিক তেমনিই। তবুও আমার অবাক লেগেছে। তার কারণ আমার আমেরিকান বন্ধুরা—না, আমি ঠাট্টা করছি না, বেশ-কিছু আমেরিকান বন্ধু আমার আছেন এবং বন্ধু হিসেবে সত্যিই তাঁরা নিখুঁত—

আমাকে জানিয়েছিলেন যে, সারা পৃথিবীতে আগুন জ্বালিয়ে দিতেই সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ বদ্ধপরিকর। কাবুলের বাসএ সেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি ভেবেছি, আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীতে যে-দেশ আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়, আগুন-নেভানো এই যন্ত্রটি কিন্তু সে-ই এখানে পাঠিয়েছে। সত্যিই কি সে আগুন জ্বালাতে চায়? সেই থেকে প্রশ্নটা আমার সঙ্গ নিয়েছে। একটা উত্তরও আমি পেয়েছি। কিন্তু প্রায় প্রতিটি আমেরিকান এবং কিছু কিছু ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসীর মনে যে ভয়াবহ আতঙ্ক রয়েছে, আমার উত্তরে যে তার সমর্থন মিলবে, এমন কথা আমি বলতে পারিনে। নিজের কথা বলতে পারি। কাবুলের বাসএ সেই রাশিয়ান আগুন-নেভানো যন্ত্রটি দেখে আমি খুশী হয়েছি।

*　　　*　　　*

"কী, সীট-বেল্ট নেই? এয়ারোফ্লটের ইলিয়ুশিন-১৪ বিমানে উঠে এই প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে আমার মনে দেখা দিয়েছিল। এর আগে আর কখনও ইলিয়ুশিন বিমানে আমি উঠিনি।

সীট-বেল্ট না থাকায় কিন্তু কিছুমাত্র অসুবিধে হল না। একটু বাদেই দেখলাম, অত্যন্তই অনায়াস ভঙ্গিতে, একটুও ঝাঁকুনি না দিয়ে, আমাদের বিমান পৃথিবী থেকে আকাশে উঠে এসেছে। আকাশে উঠলেই রাজ্যের চিন্তা এসে আশ্রয় করে আমাকে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, শুধু কি সীট-বেল্ট, আরও সহস্র রকমের বেল্ট দিয়ে কি নিজেকে আমি বেঁধে রাখিনি? এই সীট-বেল্টেরই মত আরও সহস্র রকমের জিনিস কি নেই, ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে যাদের অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়? ভারতবর্ষে যে-রকমের জীবনধারায় আমি অভ্যস্ত হয়েছি, তার প্রতি আস্থা না হারিয়েও নতুন একটি জীবনধারার পরিচয়লাভের জন্য মনে মনে আমি প্রস্তুত হতে লাগলাম। স্থির করলাম, ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় যে-ধরনের সব রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে তাদের সাক্ষাৎ যদি না-ই পাওয়া যায়, আতঙ্কিত হব না। সোভিয়েট দেশের বিমানে উঠে সীট-বেল্ট দেখতে পাইনি। ভাবতে গেলে নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তারই মধ্য থেকে আমার শিক্ষা আমি আহরণ করেছি। বুঝতে পেরেছি যে, কোনও রকমের প্রেজুডিস নিয়ে সোভিয়েট-ভূমিকে বিচার করতে যাওয়া সঙ্গত হবে না।

"তাসকেন্তে আমি অল্পক্ষণের জন্য ছিলাম। কিন্তু সেই সামান্যকালও আমার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। বিশেষ করে এই কারণে যে, আমি দরিদ্র দেশের মানুষ, এবং পথিমধ্যে দরিদ্রতর একটি দেশের আমি পরিচয় পেয়েছি। তাসকেন্তকে দেখে বুঝলাম, সমৃদ্ধির সন্ধান শুধু ইউরোপই পায়নি। মানুষজনের মাথায় অলঙ্কৃত উজবেক টুপি। শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনীকে মুছে ফেলে দিয়ে একটি সচ্ছল সুখী জীবনের এরা সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু তাই বলেই কিছু এশীয় বেশভূষাকে বিসর্জন দেবার প্রয়োজন এদের হয়নি। এবং আভিজাত্যের বোধটিকেও এরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। বিমান-বন্দরের রেস্তোরাঁয় আমি বসে ছিলাম। একজন উজবেক কৃষক এসে দোভাষীর সাহায্যে দু দণ্ড আমার সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। তাঁর আচরণে যে ঋজু মর্যাদাবোধের পরিচয় আমি পেয়েছি, সত্যি বলতে কি, এশিয়ার কোনও কৃষকের মধ্যে যে তার সন্ধান পাওয়া যাবে, এমন প্রত্যাশা আমার ছিল না। দোভাষী ভদ্রলোক ইউরোপীয়। তিনিও দেখলাম বেশ সম্ভ্রমভরেই সেই উজবেক কৃষকের সঙ্গে কথা কইছেন। দেখেশুনে আমার মনে হল, এশিয়া এবং ইউরোপের মানুষের মধ্যে পার্থক্যের যে-প্রাচীর একদা গড়ে তোলা হয়েছিল, অন্যান্য জায়গায় এখনও যার অস্তিত্ব

বর্তমান, সোভিয়েট ভূখণ্ডে সত্যিই হয়ত তাকে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ইউরোপের মানুষেরা এই একটি ব্যাপারে অন্তত, রাশিয়ানদের কাছ থেকে শিক্ষা আহরণ করতে পারেন।

*　　　*　　　*

"ভারতীয় ট্যুরিস্টের চোখে, বিশেষ করে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে এত মনোরম লাগে কেন, সেই প্রসঙ্গেই এবারে আসব।

"বিদেশে এর আগেও আমি গিয়েছি। কিন্তু আমি ভারতবাসী, শুধু এই একটিমাত্র পরিচয় দিয়ে এর আগে আর অন্য-কোনও পরিক্রমায় এতখানি সম্মান আমি পাইনি। শুধু আমি নই, আমার সঙ্গীরাও ইতিপূর্বে বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে গিয়ে ঘুরে এসেছেন। কিন্তু রাশিয়ায় এসে যে সহৃদয় অভ্যর্থনা পাওয়া গেল, অন্য কোনও দেশে তা পাওয়া যায়নি। না তাঁরা পেয়েছেন, না আমি। এ-অভ্যর্থনা পূর্বপরিকল্পিত নয়। সুতরাং বিপুলও নয়। ছোট ছোট সৌজন্য, ছোট ছোট ভদ্রতা। সারাক্ষণই যার সহৃদয় উষ্ণতাকে আমরা উপভোগ করেছি। ইনট্যুরিস্ট ব্যুরো থেকে নিপুণা একটি

মেয়েকে আমাদের গাইড হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের সুখ-সুবিধের দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। কিন্তু তার কথা আমি বলছি না। বলছি পথচারীদের সেই উৎসুক সহাস্য দৃষ্টির কথা, সারাক্ষণই যার নীরব অভ্যর্থনা আমাদের উপরে বর্ষিত হয়েছে। না, নীরবও নয়। অনেককেই আমরা বলতে শুনেছি: হিন্দী-রুশী ভাই ভাই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতীয়দের প্রতি আচরণে রাশিয়ায় যে-সম্ভ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়, ইউরোপের আর কোনও দেশেই তা পাওয়া যায় না। রাশিয়ায় এসে কোনও রকমের মুরুব্বিয়ানা আমরা দেখিনি। অতঃপর ভারতীয় ট্যুরিস্টরা যদি সোৎসাহে রাশিয়ায় আসতে থাকেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

"মস্কোয় এসে ট্যুরিস্টরা সচরাচর যা-কিছু দেখেন, আমরাও ঠিক তা-ই দেখেছি। দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় (চমৎকার), সমবায়-খামার (মনে রাখবার মত), ক্রেমলিন-ভবন (ম গ্রোমিকোকে দেখলাম ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে এসে মোটর-গাড়িতে উঠছেন। অন্য কোনও দেশে গেলেও সেখানকার কোনও রাজনীতিককে হয়ত অনুরূপ অবস্থাতেই দেখা যেত), লেনিন-মিউজিয়ম (একজন মহামানবের প্রতি তাঁর স্বদেশ-

বাসীর শ্রদ্ধা সেখানে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে); দেখেছি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী (অভিজ্ঞতাটা স্মরণীয়) আর মস্কো-মেট্রো (আমেরিকানদের ভাষায় বলতে পারি ; এ রীয়েল স্ম্যাশার) ; সর্বশেষে আমাদের মস্কো-ভল্গা ক্যানালের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হল (মনোরম। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বিশেষণ আমার মনে আসছে না)। যে-কটি বস্তুর এখানে উল্লেখ করলাম মুগ্ধ হবার জন্য যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে এর যে-কোনও একটি দেখাই যথেষ্ট। সে-ক্ষেত্রে সব কটিই আমরা দেখেছি এবং দেখেছিও প্রায় রুদ্ধশ্বাসে। সুতরাং, মনের উপরে বেশ গভীর একটি ছাপ পড়েছে। রাশিয়ানদের কর্মোদ্যোগের সাফল্যই এরা প্রমাণ করছে। সেই সঙ্গে, এরই পাশাপাশি, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় যে বিপুল গঠনকর্ম চলেছে, তাও সকলের চোখে পড়বে। বিশাল দীর্ঘ সব ক্রেন। মাল উঠছে, নামছে। কলকাতায় যত কাক দেখতে পাওয়া যায়, কিংবা ভেনিসে যত পায়রা, মস্কোতে ক্রেনের সংখ্যা তার চাইতে কিছু কম নয়।

"ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে এই প্রবন্ধ আমি শেষ করব। পরস্পরের প্রতি এরা বন্ধুভাবাপন্ন। সেই বন্ধুত্বের বন্ধন এত দৃঢ় যে, কোনও কোনও দেশের পক্ষে

সেটা ক্ষোভের কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে, হয়ত রাশিয়াতেও, এমন কিছু লোক রয়েছেন, বন্ধনটা দৃঢ়তর হলেই যাঁরা খুশী হতেন। ভারত-সোভিয়েট মিত্রতার প্রকৃতি উপলব্ধির জন্য আমি সচেষ্ট রয়েছি; এই মিত্রতাকে কী করে আরও বাড়িয়ে তোলা যায়, তাও আমি চিন্তা করব।

"কোনও মানুষ কোনও মানুষীর কাছে গিয়ে কখনও বলে না, এস, পরস্পরকে এবারে ভালবাসা যাক।' সাহচর্যের থেকেই ধীরে ধীরে ভালবাসা জন্ম নেয়। তার জন্য এক সঙ্গে কাজ করতে হয়, এক সঙ্গে থিয়েটরে যাবার প্রয়োজন ঘটে। ছু-চার দিন বাদে দেখতে পাওয়া যায়, একজনের হাত অন্যজনের হাতে বাঁধা পড়েছে। রাষ্ট্রীয় ভালবাসারও পথ হয়ত পৃথক নয়। 'হিন্দী রুশী ভাই ভাই' ধ্বনিতে আমার প্রচণ্ড কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও আমার অজানা নয় যে, রুশ-ভারত মিত্রতাকে এইভাবে ত্বরান্বিত করা যাবে না। স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে যেটুক্ সময় লাগবার কথা, অন্তত সেইটুকু সময় তাকে দিতেই হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে এই আশা নিয়েই আমি ফিরে যাচ্ছি যে, অন্তত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই দেশ এবং আমার দেশের

মধ্যে অনতিকালের মধ্যেই প্রভূত যোগাযোগ ঘটবে। 'মস্কো নিউজ'-এর কোনও সংবাদদাতা যদি কলকাতায় যান, আমি খুশী হব। আরও খুশী হব, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর প্রতিনিধি হয়ে আবার যদি আমাকে মস্কো আসতে হয়। আসবার আগে রুশ ভাষার আরও দু-চারটি কথা আমি শিখে নিতে পারব, এমন আশাও আমি করছি। আপাতত রুশ ভাষার সামান্য কয়েকটি শব্দ আমি চিনি। তার মধ্যে দুটি শব্দ আমাকে প্রায়শই ব্যবহার করতে হয়েছে—Spaseeba আর Do sveedahnya। এই দুটি কথা দিয়েই আমার প্রবন্ধ আমি শেষ করছি।"

এতদ্দেশীয় পাঠকের অবগতির জন্য আর মাত্র তিনটি কথা আমি জানাব। মস্কোতে ফিরে এসে মিঃ নিকিতিনের দপ্তরে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। লেখাটি তাঁর হাতে তুলে দেবার পর সসঙ্কোচে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লেখার জন্য তাঁরা যদি কিছু দক্ষিণা দেন, তাতে কি আমি ক্ষুণ্ণ হব? বললাম, বিলক্ষণ, দক্ষিণা না পেলেই বরং ক্ষুণ্ণ হতে পারি। ভাউচারে সই করে দক্ষিণা বাবদে ৬০০ রুবল পাওয়া গেল। এবং টাকাটা পেয়ে আমি বলশয় থিয়েটারে টিকিট কাটতে ছুটলাম। থিয়েটার থেকে

হোটেলে (এবারে উঠেছিলাম ইয়োরোপা হোটেলে) ফিরে এসে দেখি, জনৈক ফটোগ্রাফার সেখানে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। "মস্কো নিউজ"এর ফটোগ্রাফার। এতবার ইনি আমার ছবি নিয়েছেন যে, এক-এক সময় নিজেকে প্রায় মেরিলিন মনরো বা ঐ রকমের কোনও বিখ্যাত চিত্রতারকার মতন মনে হচ্ছিল। কোনও লেখককে নিয়ে এতটা হৈ-চৈ করা ভাল, না অন্যান্য দেশে লেখকদের প্রতি সচরাচর যে-রকম ঔদাসীন্য দেখানো হয় সেইটেই ভাল, তা নিয়ে অবশ্য আমার সংশয় বর্তমান।

শেষ কথাটি এবারে জানাই। "মস্কো নিউজ"-এ আমার প্রবন্ধটি পুরো ছাপা হয়নি। যেটুকু অংশ এখানে তুলে দিয়েছি, তা ছাড়া আরও দু-একটি কথা আমি লিখেছিলাম। নিতান্ত স্থানাভাবের কারণেই হয়ত মিঃ নিকিতিন আমার প্রবন্ধ থেকে অন্তত তিনটি প্যারাগ্রাফ ছেঁটে দিয়েছেন। অথবা এমনও হতে পারে, সাংবাদিকের প্রতি সাংবাদিকের মমতা দেখাতে গিয়েই তিনি খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে থাকবেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে আবার ত আমাকে এই একই বিষয় নিয়ে লিখতে হবে; সুতরাং যা-কিছু আমার বক্তব্য, একটিমাত্র প্রবন্ধেই তা যদি

নিঃশেষিত হয়ে যায়, পরে আমি অসুবিধায় পড়তে পারি। সে যা-ই হক, যে-তিনটি প্যারাগ্রাফ তিনি বাদ দিয়েছেন, তার মধ্যে আমি দু-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। তার মূল্য অবশ্যই ৬৪ হাজার ডলার নয়, কিন্তু ৬০০ রুবল ত বটেই।

নূতনা প্রাচী

ভারতবর্ষ থেকে রাশিয়া যেতে হলে কাবুলের পথে যাওয়াই প্রশস্ত। পথের দূরত্ব তাতে অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু ঘুরপথও যদি হত, তবুও বোধ হয় ভারতীয় ট্যুরিস্টদের কাবুল ঘুরিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে গেলেই ইনট্যুরিস্ট ব্যুরো বুদ্ধির কাজ করতেন। কাবুল থেকে যদি আপনি তাসকেন্ত যান, মনে হবে, বরফ-জলে চুবিয়ে তারপর আপনাকে গরম জলে স্নান করাতে নিয়ে আসা হয়েছে। মনে হবে, চিৎপুর থেকে আপনি চৌরঙ্গীতে এসে পৌঁছলেন। কিংবা কুতুব রোড থেকে কনট সার্কাসে। মানুষজন ধরে-ধরে তাদের কমিউনিজ্‌মএ দীক্ষা দেওয়াই যদি রাশিয়ানদের উদ্দেশ্য হয় (তেমন উদ্দেশ্য তাদের আছে কিনা জানিনে, কেননা এরই ফলে প্রায়শ একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে), তবে এশিয়াবাসীদের সামনে এই রকমের বিপরীত চিত্র তুলে ধরাই বোধহয় সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহজতম উপায়। ভারতীয় ট্যুরিস্টদের মধ্যে যাঁরা কদাচ ইউরোপে অথবা আমেরিকায় যাননি, কাবুল ঘুরিয়ে তাঁদের যদি তাসকেন্তে নিয়ে আসা হয়, পত্রপাঠ তাঁরা কমিউনিজমএর দীক্ষা নিতে

পারেন। যদি নেন, দোষ দেওয়া যাবে না। আফগানদের মধ্যে যাঁরা আমু দরিয়া অথবা হিন্দুকুশের এ-ধারে থাকেন, সংস্কৃতির বিচারে উজবেকদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পার্থক্য নেই। জীবনবিন্যাসে প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। উজবেকেরা বেঁচে আছে, আর আফগানরা টিঁকে আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের যে-অংশ এশিয়ায় পড়ে, তার মধ্যে এই তাসকেন্তই হল বৃহত্তম নগর। তাসকেন্তের ঐশ্বর্য দেখে ভারতীয় ট্যুরিস্ট যে এত সহজেই মুগ্ধ হয়ে যান, তার কারণ হয়ত এই যে, এশীয় সংস্কৃতিকে সে বিসর্জন দেয়নি, অথচ এশিয়ার দারিদ্র্য-বন্ধন থেকে নিজেকে সে মুক্ত করে নিয়েছে। বোখারা আর সমরখন্দ তার অতীত নিয়ে গর্ব করে, তাসকেন্ত গর্ব করে তার বর্তমানকে নিয়ে। এবং তাসকেন্তের এই বর্তমানের মধ্যেই কোন ভারতীয় ট্যুরিস্ট যদি তার আপন সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চেহারাটিকে দেখতে চেয়ে থাকেন, তাঁকে ক্ষমা করতে হবে। এতকাল তিনি শুনে এসেছেন, প্রাচীর কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাসকেন্তে এসে নূতনা প্রাচীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। এ-কথা অবশ্যই সত্য নয় যে, একমাত্র কমিউনিজমই এই রূপান্তর ঘটাতে

মানদণ্ড হাতে নিয়ে তার অধিবাসীদের অবস্থাকে বিচার করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ এখনও তারা পায়নি। তবে অনতিকালের মধ্যেই পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। তাসকেন্তের জনসাধারণকে দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এরা [illegible] মানুষ। কিন্তু তাসকেন্তকে দেখে মনে হয়, ইউরোপের কোন শহরে এসেছি। বৈপরীত্যটা আনন্দদায়ক। জনসাধারণকে দেখে মনে হয়নি যে, কোনকালে এদের মানসিক ক্ষুধা খুব বেশী ছিল। বিপ্লব এদের শারীরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। আপাতত অন্য কোন প্রশ্ন আমার নেই। অন্নবস্ত্রের গুরুত্ব বড় কম নয়। এই দুটি জিনিসই এরা এখন যে-পরিমাণে পাচ্ছে, আগে তা এদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। বিপ্লবের এই সাফল্যকে কেউ যেন হেসে উড়িয়ে না দেন। ক্ষুধাজর্জর এশিয়ার কোনও আগন্তুকের উপরে এই সাফল্যের ছবিটি যে কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাও যেন আমরা ভেবে দেখি।

* * *

তাই বলে কি রাশিয়ার কোনও খানেই দারিদ্র্য নেই? দু-একটি জায়গায় আছে। এশিয়ার দু-একটি জায়গায় যেমন সচ্ছলতা আছে। (তফাতটা কারও না-বুঝবার কথা নয়)। রাশিয়ায় এলে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশের ছবিই সকলের চোখে পড়বে। আপন সাফল্যে সে-দেশ গর্বিত। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোনও আশঙ্কা নেই। ভেবেছিলাম মানুষগুলির জীবন বুঝি-বা ঈষৎ নীরস, একটু-বা বর্ণহীন। না, তা-ও নয়। পার্কে-পার্কে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছে। প্রাণশক্তির উচ্ছল এক-একটি প্রতীক। বিমানবন্দরের রেস্তোরাঁতেও অনেককে দেখলাম। কেউ-বা আঙুর খাচ্ছে, কেউ-বা ন্যাসপাতি। কেউ-কেউ দেখলাম ভোড্‌কা অথবা বিয়ারের পাত্র নিয়ে বসে আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের স্বাধীনতা কি কেড়ে নেওয়া হয়েছে? বিচিত্র নয়। তবে তা নিয়ে এদের কোনও মাথাব্যথা আছে বলেও আমার মনে হয়নি। খোলা মাঠের মধ্যে রেস্তোরাঁ। সন্ধ্যা নামতেই রেস্তোরাঁয় সুর-তরঙ্গ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। একটু বাদেই দেখি, খদ্দেররা সব নাচতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃষক। বেশভূষাও কৃষকদেরই মত। পরিবারের সকলেই এসে আনন্দের আসরে যোগ দিয়েছেন, কেউই বাকী নেই। অপেরায় সেদিন লয়লা মজনু হচ্ছিল—এবং একটি আসনও

শূন্য ছিল না। কনসার্ট হল-এ গিয়ে দেখি, সেখানেও ঘরভর্তি মানুষ। তা এর থেকে ত মনে হয় না যে, রাশিয়ার জনসাধারণ খুব-একটা কিছু দুঃখে আছে।

এবারে আমাদের দোভাষীদের সম্পর্কে কিছু বলি। আমলাতন্ত্রের নিয়মই এই যে, যদি-বা তারা ঠিক-কাজটা করে, কাজের পদ্ধতিতে একটা গোলযোগ ঘটিয়ে বসবে। আমাদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্লেন থেকে নেমেই দেখি, দোভাষী দাঁড়িয়ে আছে। নাম এডুয়ার্ড ফেটেলসন। হায়, সে শুধু হিন্দুস্থানীই জানে, অথচ আমরা সবাই বাঙালী। ইনট্যুরিস্ট ব্যুরোর স্থানীয় কর্মকর্তা একটি বক্তৃতা দিলেন। বললেন যে, ভারতবর্ষের মতন একটি মহান দেশের প্রথম ট্যুরিস্ট দলকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে তিনি গর্ববোধ করছেন। উত্তরে আমাদেরও কিছু বলতে হয়। বলবার ভার পড়ল আমার উপর। বললাম, এক বিরাট দেশ থেকে আমরা এসেছি ; এবং আমরা আশা রাখি যে, সে-দেশ সত্যিই একদিন মহান হয়ে উঠবে। বিমান থেকে নামতে-না-নামতেই সংবর্ধনা। ফুলের মালা ইত্যাদি কোনও কিছুই বাদ যায়নি। দলের কেউ কেউ তাতে খুব খুশী হলেন। সত্যি বলতে কি, আমি তেমন খুশী হতে পারিনি। এইসব জন-

সংবর্ধনায় আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এ-সব ব্যাপারে, আর যা-ই থাক, আন্তরিকতা থাকে না।

*　　*　　*

রাশিয়ার জনজীবন সম্পর্কে আমার মৌল বক্তব্যে আমি পৌঁছে গিয়েছি। বেশির ভাগ সময় এদের নানারকমের অনুষ্ঠানেই কেটে যায়, নিভৃতির অবকাশ তাই একটু কম। বিশ্বাস না হয় ত চমৎকার ঐসব পার্ক, ঐ টাউন হল, ঐ পায়োনিয়ার্স প্যালেস, ঐ কমসোমল হেডকোয়ার্টার্স আর ঐ সমবায় খামারগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। তারপর তাকান ঐ বিরাট ফ্ল্যাটবাড়িগুলির দিকে। এবং বিবেচনা করুন যে, ওর এক-একটি বাড়িতে প্রায় হাজারখানেক পরিবারের বসবাস। অতঃপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার আপনি 'নমস্তে' সম্ভাষণটি শুনতে পেয়েছেন, তা-ও একবার স্মরণ করুন। আপনি হয়ত ভাবছেন, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই সবাই সম্ভাষণ জানিয়েছে। অমন কোনও চিন্তাকে স্বপ্নেও ঠাঁই দেবেন না। আপনাকে যে সম্ভাষণ জানান হয়েছে, তার একমাত্র কারণ এই যে, আপনি

ভারতবাসী। এবং এদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভারতবর্ষকে আজ বন্ধু হিসেবে পাওয়া দরকার। আমি মানুষ হয়েছি বুর্জোয়া ভাবধারায়। তাই গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর, একটু-বা বেদনাদায়ক, বলে মনে হয়েছে। দেশই কি সব? ব্যক্তির কোনও মূল্য নেই? ফুলের মত সুন্দর এইসব শিশু, এদের মুখের এই সম্ভাষণটুকু শুনবার জন্যও সত্যিই কি আমার বিশেষ কোনও দেশের অধিবাসী হবার প্রয়োজন ছিল? যে-অভ্যর্থনা এদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, সত্যিই তার জন্য আমার আনন্দের অন্ত নেই। এদের এই সৌজন্য হয়ত তালিম-দেওয়া। কিন্তু অসৌজন্য ত আরও খারাপ। এ-সবই আমি জানি। জানি, তবু মনের এক কোণে একটু অস্বস্তি থেকে গিয়েছে। ভেবেছি, দেশের পরিচয়ে নয়, আমার আপন পরিচয়ে এদের হৃদয় যদি জয় করতে পারতাম, হয়ত আরও ভাল লাগত। ভেবেছি, শ্রী নেহরুর পররাষ্ট্র-নীতি যাতে সফল হয়, তার জন্যে আমার তরফে কোনও চেষ্টা কখনও ছিল না; অথচ সেই নীতিরই সুফল আমি ভোগ করছি। রুশ-পরিক্রমায় শ্রীনেহরুর কাছে প্রতিপদে আমাকে কৃতজ্ঞ বোধ করতে হয়েছে। এবং সারাক্ষণই তা কিছু স্বস্তির কারণ হয়নি। মনে হয়েছে, নিজের সুনাম নয়, অন্যের সুনাম ভাঙিয়ে আমাকে খেতে হচ্ছে।

পরবর্তী কোনও প্রবন্ধে স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রির মতামত নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন হতে পারে। ইতিহাসের যে নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, রুশ সভ্যতার বর্তমান অধ্যায় সম্পর্কে তার প্রাসঙ্গিকতায় আমার সন্দেহ নেই। বস্তুত, সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে প্রায়ই তাঁর কথা আমার মনে পড়েছে। আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, ব্যষ্টি-জীবনের উপর রাশিয়ায় এখন যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাতে আপত্তির কিছু না-ও থাকতে পারে। রাশিয়া এখন কটেজ কিংবা বাংলো-বাড়ি বানাচ্ছে না ; বানাচ্ছে পার্ক, টাউন হল, ফ্ল্যাটবাড়ি আর ছাত্রাবাস। আগেকার পারিবারিক জীবনের খানিকটা অংশ হয়ত সত্যিই বিদায় নিয়েছে, এবং মানুষজনও হয়ত আগের মত নেই। কিন্তু ভুলে না যাই যে, ঐ ফ্ল্যাটবাড়িগুলিতে যারা থাকে, কিংবা টাউন-হল আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা যায়, তারাও মানুষই। রাশিয়া আজ বর্বরতার পথে ফিরে চলেছে, এমন কথা আমি কী করে বলব ?

মাস্কোভি ও সেণ্ট পিটার্সবার্গ

শহর যিনি ভালবাসেন, প্রথম দর্শনেই মস্কোকে তাঁর ভাল লাগবে। অন্যান্য শহরের সঙ্গে মস্কোর কিছু পার্থক্য নেই। থাকলেও, সামান্যই আছে। মস্কোবাসীদের ধন্যবাদ, প্রাচীন কালের সবকিছুকেই তারা ধ্বংস করেনি। সেই কোন্ যুগে কোন্ এক স্থপতি পিলার ছাড়াই মস্তবড় একটা বাড়ি তৈরি করেছিলেন, এখনও সেটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকেই বাড়িটি আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে। দেখতে পাবেন পুরনো আমলের সুন্দর সেই গির্জাটিকে, কাজ সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের আদেশে যার নির্মাতার চোখ দুটিকে উপড়ে ফেলা হয়েছিল। পাছে সে আর কোথাও গিয়ে আরও সুন্দর গির্জা বানায়। আমাদের গাইড—রায়া কুলেশোভা—এইসব গল্পই আমাদের [illegible]। গাইড হিসেবে সে অত্যন্তই দক্ষ। তার চাইতে দক্ষতর গাইডের কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনে। কবে কোনখান দিয়ে নদী বয়ে যেত, কোথায় কোন্ দুর্গ ছিল, তা-ও তার কাছে শুনলাম। প্রাচীন শহর এই মাস্কোভি। অতীত কালের অনেক স্মৃতিই এর ইতিহাসের

সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ক্রেমলিন-এর নাম যে এখনও পালটে দেওয়া হয়নি, তার গম্বুজগুলিকেও যে অটুট রাখা হয়েছে, তার থেকেই বুঝতে পারি, মস্কোবাসীরা—এমন কি, মস্কোবাসীরাও—সেই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চায় না।

তা নিয়ে কোনও গর্ব অবশ্য তারা করে না। গর্ব করে বিপ্লবোত্তর কালের ইতিহাস নিয়ে। আমাদের যে সফরসূচী তাঁরা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তার থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গাইড অবশ্য ভুলেও একবার "সমাজবাদ"-এর মতন এত নিরীহ কথাটারও উল্লেখ করল না ; এবং এমন কি, নেতৃবৃন্দের মধ্যেও সে শুধু "আমাদের মহান নেতা ভ্লাডিমির ইলিচ লেনিন"-এরই নামোল্লেখ করল। কিন্তু শুধু সেই সব বস্তুই আমাদের দেখান হল, কম্যুনিষ্ট আমলে যেগুলি তৈরি হয়েছে। (প্রসঙ্গত বলা দরকার, সফর-সূচী তৈরি করবার ব্যাপারে রায়ার হয়ত কোনও হাত ছিল না।) তাই বলে এমন কথা আমি বলছি না যে, সেগুলি দেখে আমরা খুশী হইনি। নিজের কথা বলতে পারি, ধ্বংসস্তূপ দেখে তেমন কিছু আনন্দ আমি পাইনে, কিন্তু একটু বাদেই যেহেতু লেনিনগ্রাদের প্রসঙ্গ উঠবে, এবং মস্কোর সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দেশই যেহেতু আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং কথাটা বলে জানিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল।

*　　*　　*

মস্কোর প্রায় সবকিছুই নতুন। [illegible] ধূসর সৌরভটুকু তবু বিদায় নেয়নি। স্মৃতির বেদনাভারে মন্থর হয়ে আছে। কয়েকটি রাস্তা দেখলাম খুবই প্রশস্ত। আবার কয়েকটি সরু গলিও চোখে পড়ল। দেখেই বোঝা যায়, এর পিছনে কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না। ইতিহাস-বুড়ো তার শিথিল শ্লথ আঙুলে এগুলি বানিয়েছে। দেখলাম বহুধা মস্কো নদীকে। যে-নদীর গতিপথ নিতান্তই এঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাকেও কিন্তু পুরোপুরি কৃত্রিম বলে মনে হল না। মস্কোর কাছাকাছি এক সমবায়-খামারে আমাদের শশা খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কদাচ সেই শশাকে আমার কৃত্রিম বলে মনে হয়নি। মস্কো-ভলগা ক্যানালে নৌ-বিহারের কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়ছে। আপনি বলবেন, কৃত্রিম খাল। হক কৃত্রিম। আনন্দ তাই বলে কম পাইনি। যে-জীবন স্বাভাবিক, বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাকেই অবশ্য আমি ভালবাসি; এবং এই স্মৃতিগন্ধী রচনায় সেই ভালবাসা হয়ত খানিকটা প্রকটও হয়েছে। আরও হবে, যখন আমি লেনিনগ্রাদের প্রসঙ্গে আসব। কিন্তু এ-কথাও আমি জানি যে, সে ভালবাসা নিতান্তই ভাবপ্রবণ, এবং সবসময়ে পূর্বাপর সঙ্গতিও তার থাকে না। গ্রাম-জীবন আমার ভাল লাগে। কিন্তু

দু-চার বছর যদি আমাকে গ্রামে গিয়ে কাটাতে হয়, জানি যে, আমি হাঁফিয়ে উঠব। স্বয়ং ওয়র্ডসওয়র্থও হাঁফিয়ে উঠতেন।

স্মৃতি-রোমন্থনের দরকার নেই। তার চাইতে মস্কোকে বরং একটি নতুন, বৃহৎ এবং প্রসারশীল শহর হিসেবে গ্রহণ করুন, যে-শহর সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী। এবং তখনই বুঝতে পারবেন যে, আধুনিক মস্কোতেও অনেক-কিছুই দেখবার রয়েছে, আনন্দলাভের অনেকানেক উপকরণ। লেনিন হিল্‌স-এর উপরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়। বিপুল অট্টালিকা। শুধুই বিপুল নয়, সুন্দরও। বাড়িটা যে মোট ক'তলা, অথবা ছাত্র-সংখ্যা যে কত (২ হাজার ?) তা আমার মনে নেই। দেখে শুধু এই বোধটাই জেগে ওঠে যে, হ্যাঁ, একটা বিরাট দেশের ছাত্রসমাজকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য বেশ ঢালাওভাবেই একটা-কিছু করা হচ্ছে বটে। সোভিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থায় কারিগরী শিক্ষার উপরেই যে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তা কারও অজানা নয়। যে-কোনও দেশের চাইতে বেশি সংখ্যায় সেখানে এখন এঞ্জিনিয়ার গড়ে তোলা হচ্ছে। তাই বলে যে শিক্ষার অন্যান্য বিষয়কে সেখানে অবহেলা করা হয়, এমন কথা স্বপ্নেও ভাববেন না। দর্শনশাস্ত্রের একাধিক ছাত্রের সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে

কেউ কেউ আবার ভারতীয় দর্শনের ছাত্র। বিদেশী ভাষা শিক্ষ আগ্রহও কিছু কম নয়।

*　　　*　　　*

শ্রীনেহরু ইদানীং সমবায়-কৃষির কথা খুব বলছেন। রাশিয়া থাকতে ছোটখাট যে সমবায়-খামারটি আমাদের দেখানে হয়েছিল, প্রসঙ্গত তার এখানে উল্লেখ করতে পারি। খামারে যিনি চেয়ারম্যান (নাকি তাঁকে ডিরেক্টর বলা হয়?) তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। মোটাসোটা মানুষ, মেজাজটিও শরিফ। কথা কইছিলেন ধীরেসুস্থে। তাঁর সেই [illegible] ভাবটি দেখে মনে না-হয়েই পারে না যে, তিনি শহুরে আমলা নন পুরুষানুক্রমে চাষবাস নিয়ে আছেন। খামার সম্পর্কে খুঁটি-নাটি যাবতীয় তথ্য তিনি জানালেন। তাঁর সবকথা আমি বুঝতেও পারিনি। তবে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, যে-কাজ নিয়ে আছেন, তা নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত নেই। রাষ্ট্রই খামারের মালিক; তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু জমির মালিকানা চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়; সেই জমির ফসল তারা বিক্রিও করে থাকে। কী করে এটা সম্ভব হয়, তার একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন।

যদিচ সেই ব্যাখ্যাটা আমি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তিনি নিজেই অবশ্য বললেন যে, পদ্ধতিটা একটু জটিল তাতে সন্দেহ নেই এবং এটাকে আর-একটু সহজ-সরল করবার চেষ্টাও নাকি চলছে। কী জানি কেন, ভদ্রলোককে দেখে সারাক্ষণই আমার মনে হচ্ছিল যে, টলস্টয়ের সাহিত্যে এ-রকমের একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। একটু বাদেই অবশ্য কথাবার্তার মোড় ঘুরে গেল। অলস কর্মীদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হয়, এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বললেন, "কর্মীরা কখনও খারাপ হয় না। ত্রুটি যদি ঘটেই, সে দোষ নেতাদের। এই খামারে যতখানি ফসল ফলবার কথা, তা যদি ফলান না যায়, ত বুঝতে হবে, আমার কাজেই কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে। তার জন্য আর কাউকে আমি দোষ দিতে যাব না।" নেতার উপযুক্ত কথা, তাতে সন্দেহ করিনে, কিন্তু উক্তিটা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। রাশিয়ায় এখন ব্যক্তি-পূজার কড়া [illegible] চলছে। এ-সব উক্তি তারই পরিণাম কিনা জানিনে।

গোর্কি স্ট্রীটের ঠিক উপরেই আমার ঘর। সকাল ছটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে রাস্তার ধারের জানালাটি আমি খুলে দিতাম। এবং রোজই দেখতে পেতাম, রেড স্কোয়্যারের কাছে

কাতারে কাতারে লোক এসে লেনিন আর স্ট্যালিনের স্মৃতি-সৌধের সামনে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিউয়ের দৈর্ঘ্য বড় কম নয়। মাইল খানেক ত বটেই। সোভিয়েট ইউ-নিয়নে ট্যুরিস্টদের খুব খাতির। স্মৃতিসৌধে ঢুকবার জন্য তাই আমাদের কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। গিয়ে কোনও লাভও হয়নি। এ-কথা বলবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মৃত ব্যক্তিদের আমি অসম্মান করতে চাই। বলছি এই কারণে যে, ব্যক্তিত্ববাদে আমার কোনও কালেই আস্থা ছিল না। রাশিয়ানদের আস্থা যে পুরোপুরি নষ্ট হয়নি, লম্বা ঐ কিউ-ই তার প্রমাণ। সন্ধ্যা ৬টায় আর-একবার জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তখনও দেখলাম কিউয়ের দৈর্ঘ্য এতটুকু কমেনি। কাচের আধারের মধ্যে লেনিন আর স্ট্যালিনের শবদেহকে ওখানে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। তার খুব কাছে অবশ্য আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না, তবে দূর থেকেই আপনি দেখতে পাবেন যে, দুই নেতার কারও মুখেই এতটুকু অশান্তির ছাপ নেই। দেখে, "য়ুদারিং হাইট্‌স"এর শেষের সেই অবিস্মরণীয় কথাগুলি আমার মনে পড়েছিল ঃ "তাদের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।......প্রশান্ত পৃথিবী, তারই কোলে মাথা রেখে প্রগাঢ় শান্তিতে তারা ঘুমিয়ে রয়েছে। এদের নিদ্রা যে কখনও বিঘ্নিত হয়েছিল, ভাবতেও

পারা যায় না।" কিন্তু কথাটা হল এই যে, শবদেহের সান্নিধ্য আমার ভাল লাগে না। তার মধ্যে একটি যদি স্ট্যালিনের হয়, তবুও না।

*　　　*　　　*

যে-শহরে নদী নেই, হৃদয় বলে কোনও পদার্থও তার নেই। লেনিনগ্রাদে গিয়ে দেখলাম, জলের সেখানে ছড়াছড়ি। লেনিনগ্রাদের চেহারা অবশ্য ভেনিসের মতন অতটা স্বর্গীয় নয়। তার যোগাযোগ বরং মর্তের সঙ্গেই বেশী। কিন্তু তারই মধ্যে এমন একটি সুশ্রী রুচির ছাপ রয়েছে, মস্কোর চেহারায় যার অনুপস্থিতিটাই লক্ষণীয়। লেনিনগ্রাদের মধ্যে এখনও, প্রধানত, সেই সেন্ট পিটার্সবার্গকেই খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রাচীন কালের সেই বন্দরটিকে, পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে যে একদিন সর্বপ্রথম রাশিয়ার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল। দেখে বিস্মিত হয়েছি এবং আনন্দিতও কম হইনি যে, প্রাচীনের পাশাপাশি নূতন যুগের কীর্তিও এখানে গড়ে উঠেছে। লেনিনগ্রাদের চাইতেও সুন্দর শহর রাশিয়ায় হয়ত আছে। থাকলে আমি দেখিনি। যে-কটি শহর সেখানে

আমি দেখেছি, লেনিনগ্রাদই তাদের মধ্যে সুন্দরতম। শহরের প্রান্তে নেভা নদী। শাড়ির পাড়ের মতন শহরটিকে সে বেষ্টন করে রয়েছে। সময় করে “[illegible]ও গিয়ে দেখে আসতে পারেন। এইখান থেকেই শীতকালীন প্রাসাদ আক্রমণের সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল। আর এই সব দেখে যে-মানুষটির কথা আপনার মনে পড়বে, তিনি পিটার দি গ্রেট। রাশিয়ার পুরুষদের যিনি শ্মশ্রুমোচন করিয়েছিলেন, রাশিয়ার নারী-সমাজকে যিনি অবগুণ্ঠনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। রাশিয়ায় সর্বপ্রথম যিনি একটি বাণিজ্য-বন্দর প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তিনিও এই পিটারই। তিনিই প্রথম রাশিয়ায় হাসপাতাল তৈরি করান, সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। এই লেনিনগ্রাদ, এ ত তাঁরই সৃষ্টি। তাঁরই একাধিক কীর্তিকে সে এখনও সগর্বে ধারণ করে রয়েছে। বোলশেভিকরা যদি শহরের পেট্রোগ্রাদ নামটাকে না পালটাতেন, সেইটেই শোভন হত। (সেন্ট পিটার্স বার্গের বার্গ কথাটির উৎপত্তি জর্মান। সুতরাং সেটিকে বাদ দিতে হয়েছে। আর “সেন্ট”কে বাঁচিয়ে রাখার ত কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।)

পশ্চিমী সভ্যতাকে আমি ভালবাসি। হয়ত সেইজন্যই

লেনিনগ্রাদকে আমার ভাল লেগেছিল। তাই বলে যে অন্য কোনও হেতু ছিল না, এমন নয়। এককালে সে-ই ছিল রাশিয়ার রাজধানী। রাজধানী এখন স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি বাঙালী। তাই কলকাতার অতীত গৌরবের কথা আমার মনে পড়েছিল। গাইড যখন আমাদের নানান দ্রষ্টব্য বস্তুর পরিচয় দিচ্ছিল, তার কণ্ঠস্বরে তখন বেদনা অপ্রকট থাকেনি। তারও বাড়ি লেনিনগ্রাদে। সে বলছিল, "ঐ যে বাড়িটি দেখছেন, ওটি হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমি। মানে ওইখানেই এক সময়ে বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির সদর-অফিস ছিল। এখন ওটি হল শাখা-অফিস।" লেনিনগ্রাদ আমাকে কলকাতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। না দিলেও তাকে আমি ভালবাসতাম। ভালবাসতাম এই কারণে যে, সারাক্ষণই তার জনসাধারণ কাজ নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে না। অবসরের মর্যাদা তারা বোঝে, কথাও কয় ধীরে-সুস্থে। এবং কথাবার্তার অবকাশে অত্যন্তই বিনম্রভাবে এমন আভাসও তারা দিয়েছে যে, মস্কোর মানুষ শুধু কাজই বোঝে, আর লেনিনগ্রাদের মানুষ জীবনের অন্যতর মূল্যকে এখনও বিস্মৃত হয়নি। জ্যানেট (তার কথা পরে আসবে) বলছিল, সে দরিদ্র বটে, তবে লেনিনগ্রাদের মেয়ে, এবং সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। মনে হল, কথাটা সে গর্বভরেই বলছে। আসলে, স্ববারির মৃত্যু

এত সহজে ঘটে না। তাতে দুঃখিত হবার কারণ নেই বিশেষ করে এই কারণে যে, সব এখানে সুন্দরী। জেনেট সুন্দরী মেয়ে। লেনিনগ্রাদও সুন্দর। জ্যানেটকে দেখে মনে হচ্ছিল, ডস্ট্য়েভ্স্কির কোনও নায়িকা যেন রক্তমাংসের শরীরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিহাসের প্রাখর্য নেই, ম্লান বিষণ্ণ তার মূর্তি। জ্যানেটের মধ্যে নারীসুলভ যে কমনীয়তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সোভিয়েট রাশিয়ার নারীসমাজে, তা এখন দুর্লভ বললেও চলে।

সোভিয়েট নারী

একা-একা বিদেশে যাবার একটা মস্ত বড় অসুবিধে এই যে, ইচ্ছেমতন সেখানে কারও সঙ্গ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গ। বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায়। যাত্রার লক্ষ্যস্থল যদি হত লণ্ডন অথবা প্যারিস, এতটা অসুবিধে তা হলে ঘটত না। বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বন্ধুর বন্ধুর কাছে সেটিকে পৌঁছে দেওয়া চলত, এবং সেই সূত্রে বন্ধুর বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনও নিশ্চয়ই অসম্ভব হত না। কাবুলে যদি যান, সঙ্গ অবশ্যই পাবেন, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গ নয়। মেয়েরা সেখানে অসূর্যম্পশ্যা। বলতে কি, কালো-কালো বুরখা দেখলেই আমার ভয় করে। শরীরের আর কোনও অংশকেই দেখতে পাচ্ছিনে, শুধু পায়ের পাতা দুটিকে দেখছি। এবং দেখতে দেখতে এক-এক সময় মনে হয়েছে, যেন মানুষ নয়, যেন কোন প্রেত-মূর্তি হেঁটে চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েরা অবশ্য বুরখাবৃতা নন। পথেঘাটে অসংখ্য মেয়ে আপনি দেখতে পাবেন। কর্মজীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁরা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁদের কারও সঙ্গেই

আমার পূর্ব-পরিচয় ছিল না। আমার সঙ্গে ত না-ই, আমার কোনও বন্ধুর সঙ্গেও না। সোভিয়েট রাশিয়ায়, সুতরাং, খুব কম মেয়ের সঙ্গেই কথাবার্তার সুযোগ ঘটেছে। ভাগ্য নিতান্ত সদয় না হলে, তাও হয়ত ঘটত না। কোনও দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে হলে তার নারী সমাজকেও জানতে হয়। এ-কথা সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কেও সত্য। যদিচ ট্যুরিস্ট-মাত্রেই রাশিয়ায় গিয়ে দেখতে পাবেন যে, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের বিস্তর অসুবিধে সেখানে রয়েছে। ভাষার পার্থক্যই তার একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। নারীসমাজ আর ট্যুরিস্টদের মধ্যে যেন একটা কাচের দেওয়াল তুলে রাখা হয়েছে। সেই দেওয়ালের এদিক থেকে মেয়েদের আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কাউকে কাউকে দেখে নয়নযুগল তৃপ্তও হচ্ছে। হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না, যাঁরা বলেন যে, রাশিয়ান মেয়েমাত্রেরই ওজন দু টন, তাঁরা একটু বাড়িয়ে বলেন। কিন্তু, যে-কথা বলছিলাম, শুধু দেখেই আপনাকে খুশী থাকতে হবে।

ইতিপূর্বে এডুয়ার্ড ফেটেলসনের পরিচয় আপনাদের দিয়েছি। এডুয়ার্ড ছিল আমাদের দোভাষী, এবং ভারতীয় ভাষার মধ্যে একমাত্র হিন্দীটাই সে জানত। এডুয়ার্ডের

দ্বিতীয় ত্রুটি, সে ছেলে। তাকে বিদায় দেওয়া হল। তার জায়গায় এল মার্গারিটা। নম্র মেয়ে। শান্ত একটি লাবণ্য তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। মার্গারিটা আমাদের কাছে মার্গারিটার বেশী থাকেনি। পরে এল রায়া কুলেশোভা। রায়াই সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকেছে। এক ঠাণ্ডা অন্ধকার রাত্রির মধ্যযামে যখন মস্কো থেকে বিদায় গ্রহণ করি, তার দু মিনিট আগে পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে ছিল। কাজেকর্মে রায়ার দক্ষতা যে কী অসাধারণ, আগেই তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু নিতান্ত কর্মদক্ষতার জন্যই কোন মেয়েকে যদি মনে রাখি, সেটা কি তার পক্ষে খুব গৌরবের কথা? রায়ার পক্ষে যে গৌরবের, তাতে সন্দেহ করিনে, কেননা একমাত্র কাজকেই সে ভালবাসত। বিবেচনা করি, কমিউনিজ্‌মএর কল্যাণে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে নূতন নারী-সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, রায়াই তার নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি। দেখে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। আবার আশঙ্কা হয়নি, এমন কথাও বলতে পারিনে। রায়াকে দেখে সারাক্ষণই আমার মনে হত, এমন কোনও কাজ নেই, যা তার অসাধ্য। অসাধারণ কর্মনিপুণা মেয়ে। যে-কাজ মস্কোতে ছাড়া হবার উপায় নেই, লেনিনগ্রাদে থাকতে সরকারী দপ্তর থেকে সেই কাজই সে যখন পাঁচ মিনিটে আদায় করে নিল, অফিসার

ভদ্রলোক তাকে বলেছিলেন, "যাবার আগে একটা কথা শুধু জেনে যান; আপনার দৃঢ়তা দেখে সত্যিই আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি আমার স্ত্রী নন।" গল্পটা আমি রায়ার কাছেই শুনলাম। পরিহাসচ্ছলেই বলছিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটাকে যে সে তার কর্মদক্ষতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চায়, সেটুকু বুঝতে কষ্ট হয়নি। রায়ার অপ্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেননা যে অপরিসীম যত্ন সে আমাদের নিয়েছে, তার তুলনা হয় না। কিন্তু তবু, কিন্তু তবু সারাক্ষণই এই বোধ আমাকে পীড়া দিয়েছে যে, এই যত্নের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ খুব বেশী ছিল না। যত্ন নিয়েছে, কেননা যত্ন নেবারই নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছিল। যদি তাকে নির্দেশ দেওয়া হত যে, গুলী করে আমাদের মারতে হবে, অকাতরে সেই নির্দেশ সে পালন করত। কথাপ্রসঙ্গে রায়া একদিন বলছিল, সে নাকি ভাল বন্দুক চালাতে পারে। ইনটুরিস্ট ব্যুরো যে তাকে বন্দুক চালনার নির্দেশ না দিয়ে যত্ন নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ব্যুরোর কর্তৃপক্ষের কাছে তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

*　　*　　*

রাশিয়ায় থাকতে নানা রকমের দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে। তার মধ্যে একটি দৃশ্যের অর্থ এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। খুব ভোরে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। আর তখনই দেখতে পাওয়া যেত যে, থুথুরে একদল বুড়ী সেই সকালে—সেই হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা সকালে—রাস্তা ঝাঁট দিয়ে চলেছে। রাশিয়ার রাস্তাঘাট অত্যন্তই পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পূর্বোক্ত দৃশ্যটি দেখবার পর সেই পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যথোচিত শ্রদ্ধাবোধ আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হত। যদি দেখতাম যে, রায়াকে রাস্তা ঝাঁট দিতে দেওয়া হয়েছে—প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রায়া স্বাস্থ্যবতী মেয়ে; বয়স বছর বত্রিশ—তা হলে অবশ্যই তেমন কিছু বিস্মিত আমি হতুম না। এবং রায়াও যে তাতে খুব অসুখী হত, তাও আমার মনে হয় না। সে হয়ত মেনেই নিত যে, রাস্তা ঝাঁট দিয়েই সে দেশের সেবা করছে, বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করছে। কিন্তু ওই বৃদ্ধারা এ-কাজ করছে কিসের প্রেরণায়? বিপ্লবী প্রেরণায়? বিশ্বাস হয় না। কিসের তাড়নায়? ক্ষুধার? কিন্তু ক্ষুধা ত পুঁজিবাদের সঙ্গী। হতে পারে যে, তরুণসমাজকে যেহেতু কারখানা আর খামারের কাজে পাঠানো হয়েছে, এবং ওই বৃদ্ধারা

যেহেতু অন্য আর কোনও কাজেরই উপযুক্ত নয়, তাই হয়ত ওঁ পোড়া কপালে বিধি এ-দারুণ অভিশাপ লিখে থাকবেন কিন্তু এ-ব্যাখ্যাও কি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবার মত? কর্ম-ভার বণ্টনের এই নীতির মধ্যে যে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে, সে-কথা অস্বীকার করিনে। কিন্তু হৃদয়বত্তার যে পরিচয় নেই, তাই বা কী করে অস্বীকার করি? না কি এ-সবই শুধু ভাবপ্রবণতা?

রায়ার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ছোট্ট একটি মেয়ে আছে রায়ার; বয়স এই বছর তিনেক। মেয়ে দিদিমার কাছে থাকে। নিজের ঘর-সংসার সম্পর্কে রায়া খুব কম কথা বলত। এবং যেটুকু বলত, তার চাইতে যে বেশী ভাবত, এমন আমার মনে হয়নি। মোট দশ দিন সে আমাদের সঙ্গে ছিল। সকাল থেকে রাত্রি, সারাক্ষণ। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পরেও বোধ হয় সে বিশ্রাম নিত না, পরের দিনের কর্মসূচী ঠিক করতে বসত। সময় কই যে মেয়ের কিংবা মেয়ের বাবার কথা চিন্তা করবে? কর্মক্ষেত্রে সুনাম অর্জনের জন্য প্রত্যেককেই কিছু না কিছু মূল্য দিতে হয়। সে-মূল্য আমরাও দিই, যদিও খুশী মনে দিই না। রায়া দেখলাম খুশী মনেই দিচ্ছে। কাজের নেশায় সে বুঁদ হয়ে আছে।

যে-কজন ট্যুরিস্টের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে, দর্শনীয় সমস্ত কিছুই যাতে তাঁরা দেখে নিতে পারেন, তার জন্য তার চেষ্টার অন্ত নেই। এ সবই খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি যেহেতু পাতি বুর্জোয়া মানুষ, তাই এত সব সত্ত্বেও—হয়ত এত সবের জন্যই—রায়ার প্রকৃতিকে আমার কখনই যেন পুরোপুরি মানবায় বলে মনে হয়নি। এ কেমন মেয়ে, মনে যার এতটুকু সংশয় নেই? লেনিন মিউজিয়মে গিয়ে এটা-ওটা দেখে বেড়াচ্ছি। দেখতে দেখতেই রায়াকে একসময় প্রশ্ন করলাম, বিপ্লবের ব্যাপারে ট্রট্স্কির ভূমিকা ত নেহাত গৌণ ছিল না; তা এই মিউজিয়মে তাঁর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই কেন? শুনে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল রায়া, যেন ঘোরতর অশ্লীল কোনও প্রশ্ন করেছি। মিনিট খানেক ঐভাবে তাকিয়ে থেকে তারপর বলল, "নেই, তার কারণ এটা লেনিনের মিউজিয়ম, ট্রট্স্কির নয়। তা ছাড়া ট্রট্স্কি ছিল বিপ্লবের শত্রু।" আমি বললাম, "উত্তম। কিন্তু একই কারণে—অর্থাৎ যেহেতু এটা শুধুই লেনিনের মিউজিয়ম, সুতরাং—স্ট্যালিনের [illegible] এত ঘটা করে এখানে রেখে দেওয়া তোমাদের উচিত হয়নি। আর তুমি বলছ ট্রট্স্কি ছিলেন বিপ্লবের শত্রু। লেনিন কিন্তু বিপ্লবের এই শত্রুটির উপরে অনেকখানিই নির্ভর করতেন। লেনিন যদি শত্রুকে বন্ধু ভেবে থাকেন, তা হলে তাঁকে বোকা

বলতে হয়। মুশকিল এই যে, লেনিনকে আমি বোকা বলে ভাবতে পারছিনে।" শুনে রায়া বলল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবারে হোটেলে ফেরা যাক। নয়ত আবার আপনাদের খেতে দেরি হয়ে যাবে। তর্কটা বরং কাল হবে।" সেই "কাল" আর আসেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যখনই কোনও রাশি-য়ানকে আমি রাজনৈতিক আলোচনায় টানতে চেয়েছি, তখনই অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ত যে, খেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবং আলোচনাও সুতরাং মুলতুবী থাকত। কী এর কারণ জানিনে।

* * *

আমার কথাই ধরুন (এখানে বলে রাখি, নামগুলি আমি যেমন শুনেছি, ঠিক তেমনই লিখলাম। পুরো নাম কেউই প্রায় জানাতে চাইত না। এবং নামের আদ্যংশও সঠিক জানাত কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। এর থেকেই বোঝা যাবে, বিদেশীদের সম্পর্কে কী এদের প্রকৃত মনোভাব। এ নিয়ে অবশ্য আমি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করিনি।) গোর্কি স্ট্রীটের অদূরে এক সিগারেটের দোকানে চলেছি,

এমন সময় পাশ থেকে কে একটি মেয়ে অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করল, "ইণ্ডিস্কি?" বললাম, "দা, দা।" মেয়েটিকে কেমন বোকা-বোকা লাগছিল। হয়ত তার হামাগুড়ি ইংরেজীর জন্যই। বলল, "আ, ইণ্ডিয়া, আমার স্বপ্নের ইণ্ডিয়া—আগ্রা, কালকুট্টা, ডেল্‌হি, বানারাস। ডেলিগেশন?" বললাম, "নিয়েৎ। আমি ট্যুরিস্ট।" কথা বলতে বলতে বারেবারেই সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। বুঝলাম নার্ভাস বোধ করছে। কিন্তু কী তার কারণ, সেটা বুঝতে পারলাম না। একটু বাদে বলল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদেশীর সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না। হাঁটা যাক। স্বাধীনতা নেই। আমি? কথা বলতে ভয় করছে। কমিউনিস্ট?" আবার বললাম, "নিয়েৎ, নিয়েৎ।" মেয়েটি বলল, "আমিও না। কথা বলবার উপায় নেই। স্বাধীনতা নেই।" প্রশ্নের উত্তরে সে বলল যে, তার নাম আনা। বুঝলাম, আর কোনও প্রশ্ন করে লাভ হবে না। তখন বললাম, "কোথাও গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক।" প্রস্তাব শুনেই বিবর্ণ হয়ে গেল আনা। চাপাগলায় বলল, "না, না। তোমার সঙ্গে যদি কফি খাই, বিপদ ঘটবে। তা ছাড়া আমি তোমার মত গুছিয়ে ইংরেজী বলতে পারিনে।" গোটা ব্যাপারটাই যে উদ্ভট গল্পের মত শোনাবে, তা আমি জানি। পাঠক যদি কথাটা বিশ্বাস না করেন, তাঁকে দোষ

দেব না। তার কারণ, আমার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখেও যদি এমন কোনও ঘটনার কথা আমি শুনতুম, আমার নিজের পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হত। ব্যাপারটার উল্লেখ করব কিনা, এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা ছিল। ভেবে দেখলাম, ঠিক যেমন-যেমন ঘটেছে, উল্লেখ করাই ভাল। ঘটতেই যদি পারে, লিখতে না পারার কোনও কারণ নেই। আর তা ছাড়া, আনা অস্বাভাবিক হতে পারে, তার কথা পুরো সত্য না হতে পারে।

এবারে জ্যানেটের কথা বলি। জ্যানেটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কৃষিপ্রদর্শনীতে। (এমন প্রদর্শনী এর আগে আমি দেখিনি। আলাপ হয়েছিল সম্পূর্ণই আকস্মিকভাবে। আনার মত নার্ভাস মেয়ে সে নয়। শান্ত গলায় সে বলল যে, মাস ছয়েক আগে দেখা হলে আমার সঙ্গে সে কথাই বলত না। তার কারণ, "বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাটা তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না।" জ্যানেটের মত আরও অনেক মেয়ে রাশিয়ায় আছে, তাতে সন্দেহ নেই ঃ তবে রাশিয়ায় গিয়ে যে-কটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জ্যানেটই দেখলাম, ইংরেজীতে রসিকতা করলেও তার মর্ম বুঝতে পারে। জ্যানেট সুন্দরী মেয়ে।

কথাপ্রসঙ্গে কী একটা মন্তব্য করেছিলাম। মন্তব্যটা যে অস্কার ওয়াইল্ডের, তা তার বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ব্রাউনিং থেকে লাইন কয়েক মুখস্থও বলে ফেলল। (ব্রাউনিং কেন? কেন নয়?) বলল যে, আগামী বছর ইংরেজী ভাষায় সে ডিগ্রী পাবে। তার পর? "শিক্ষয়িত্রী হতে আমার এতটুকুও ইচ্ছে নেই ঃ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়ত হতে হবে।" শুনে বললাম, "ইনটুরিস্ট ব্যুরোতে গাইডএর চাকরি নিলেই ত পার। তুমি যখন ইংরেজী শিখতে চাও, গাইডএর চাকরি নেওয়াই ভাল। তাতে ইংরেজী বলবার সুযোগ পাবে।" শুনে কেমন মনমরা হয়ে গেল জ্যানেট। তারপর বলল, "সব কথা তোমাকে জানান সম্ভব নয়।" কিন্তু আমি জানি যে, কোনও কথা না বলেই সে সব কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। নীরবতাও এক-এক সময় বাঙ্ময় হতে পারে। আলোচনার বিষয়বস্তু অতঃপর পালটে গেল। আমার পরনে ছিল একটি পুরনো কার্ডিগান। অনেকক্ষণ থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে, সেটির দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। খানিক বাদে সে প্রশ্ন করল, "তোমার ঐ জামাটা কি ভারতবর্ষে তৈরী?" বললাম, "না, বছর ছয়েক আগে সুইটজারল্যাণ্ডে এটি কিনেছিলাম।" বলল, "কার্ডিগান মেয়েরাও পরে।" রাশিয়া আজকাল বাইরে থেকে প্রায় কোনও কিছুই আমদানি করে না। পরে এক

সময়ে আমার মনে হয়েছিল, সেদিন আমার কার্ডিগানটা যদি জ্যানেটকে উপহার দিতে চাইতুম, খুশী মনেই সে গ্রহণ করত। মুশকিল এই যে, মনে যখন হল, তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

কথাটা তাহলে কী দাঁড়াল? সেই কথাতেই আসছি। যে মেয়ে রাশিয়ায় জন্মেছে, জীবনে তাকে যদি সুখী হতে হয় ত রায়ার পন্থা গ্রহণ করাই তার পক্ষে শ্রেয়। অর্থাৎ কাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, যে-কটি কথা না বললেই নয়, শুধু তার মধ্যেই তোমার ভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখো, এবং তার বেশী কিছু চিন্তা করতে যেও না। ঈশ্বরের দোহাই, কাজ করতে করতে যেন এক মুহূর্তের জন্যও থেমে দাঁড়িও না। কেননা, থামলেই হয়ত মনের মধ্যে সংশয় জাগবে। এবং একবার যদি সংশয় জাগে, দুঃখের সীমা থাকবে না। সারাক্ষণ কাজ কর। খাটতে খাটতে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে, ঘুমে যখন জড়িয়ে আসবে দুই চোখ, চুপটি করে গিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দাও। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আবার কাজ

শুরু করতে হবে। আমার সন্দেহ হয়, আনা হয়ত কাজ করতে করতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত জ্যানেটও। রাশিয়ার জীবনস্রোত থেকে তারা তাই দূরে সরে গিয়েছে। হয়ত সেই কারণেই তারা আমার জীবনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।

প্যারিসে জন্মালে জ্যানেট সুখী হতে পারত। কে জানে, প্যারিসে জন্মালেই সে হয়ত কমিউনিজ্‌মকে ভালবাসতে পারত। রাশিয়ায় থেকে কমিউনিজ্‌মকে সে ভালবাসতে পারেনি। সে এখন লাইব্রেরিতে যায়, গিয়ে ইংরেজী আর ফরাসী নভেলে পুরনো আমলের রসাস্বাদ করে। বই পড়া শেষ হলে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসে, রাস্তায় এসে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হয়। জ্যানেট কি তাকে ভালবাসে? "কী করে বাসব? ও যে মস্কোর মানুষ। তবু যে ওর সঙ্গে মিশি, তার কারণ ওর পয়সা আছে। গত শীতে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম, এবারে ও আমাকে একটা ওভারকোট কিনে দেবে বলেছে।"

এ ছাড়া এমন-কিছু মেয়ে আছে, যারা কমিউনিস্ট নয়, আবার কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতিও যাদের নেই। কী করে তারা? ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়

হয়েছিল। শুনলাম, একটু বাদেই সে চার্চে যাবে। অত্যন্তই সংক্ষিপ্ত তার কাহিনী। মেয়েটি আগে কিয়েভে এঞ্জিনীয়ারের কাজ করত। পাঁচ মাস দশ দিন আগে সে এক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নেই সে জানতে পায় যে, শিগগীরই এই মস্কো শহরে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব ঘটবে, খ্রীষ্টকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সামান্য যে দু-চারজনকে ঠিক করে রাখা হয়েছে, সে তার অন্যতম। এঞ্জিনীয়ারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে তাই মস্কোতে চলে এসেছে। সে এখানে পরিচারিকার কাজ করে। এঞ্জিনীয়ারের চাকরিতে মাসে সারে ছ হাজার রুবল মাইনে পেত। এখন পায় তিন শ রুবল। মেয়েটির নাম তানিয়া। বয়স পঁচিশের বেশী হবে না। সুন্দরী। যে-ফ্ল্যাটে সে পরিচারিকার কাজ নিয়েছে, তার পাশের ফ্ল্যাটে কাজ করে পঞ্চাশ-ষাট বছরের এক বৃদ্ধা। খ্রীষ্টের আসন্ন আবির্ভাবে দুজনেই তারা সমান বিশ্বাসী। তা, এরা কি কোনও কিছুর কাছ থেকে পালাতে চাইছে? নাকি মহত্তর কিছু লাভ করতে চলেছে? উত্তরটা আমার জানা নেই। রাশিয়ায়, অথবা মানবজীবনে এমন কী আছে, যার কাছ থেকে পালাবার দরকার হয়? অন্য কোথাও এমন কী আছে, যা পেয়ে লাভবান হওয়া যায়? তানিয়াকে আমি বুঝে উঠতে পারিনি। একমাত্র জ্যানেটকেই হয়ত আমি বুঝেছিলাম। ছোট্ট, শীর্ণ,

অসুখী সেই মেয়েটি, তার হাসির মধ্যেও যেন বিষাদ মাখান ছিল। এমন কিছু সে পেতে চেয়েছে, রাশিয়ায় কেন, কোনও দেশেই যা নেই। জীবন যা তাকে দিতে পারবে না।

ভারত-রুশ মৈত্রী

ডঃ জনসন একদা বলেছিলেন, বন্ধুত্বকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় ত সারাক্ষণ তাকে মেরামত করা দরকার। এ-উক্তির যাথার্থ্যে আমি সন্দেহ করিনে; তবু বলা ভাল যে, মৈত্রী স্থাপনের জন্য অবিশ্রান্ত শ্রমসাধনে আমার রুচি নেই। তাতে কোনও লাভও হয় না। সচরাচর যে-সব বন্ধুত্বে আমি উপকৃত হয়েছি, তার অস্তিত্ব কদাচ খুব প্রকট ছিল না। চেতনার অন্তরালেই ধীরে ধীরে তাদের বিকাশ ঘটেছে। সচেতন হয়ে উঠেই বরং দেখেছি যে, তাতে সুর কেটে যায়। সবকিছু আর আগের মতন থাকে না। এ ত গেল মানুষী প্রেমের কথা। দেশে দেশে যখন প্রণয় ঘটে, আরও পঞ্চাশ রকমের ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়। ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিন যখন কলকাতায় আসেন, সেই প্রণয় তখন আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ তখন কলকাতার পথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে "হিন্দী-রুশী ভাই ভাই" বলে চেঁচিয়েছে। তাতে করে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষ আর সোভিয়েট রাশিয়ায় মানুষ আজ পরস্পরের আরও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কথাটাকে অসংশয় চিত্তে মেনে নিতে পারিনে। বড়জোর

এইটুকুই এতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষ আর রাশিয়ার মধ্যে যে আজ মৈত্রী স্থাপিত হওয়া দরকার, দুই দেশই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। হয়ত তা-ও প্রমাণিত হয় না। এত উচ্ছ্বাসের হেতু হয়ত এইমাত্র যে, দুই দেশের পররাষ্ট্র-দপ্তরের জনসংযোগ বিভাগ ঈষৎ কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাই বলে এমন কথা আমি বলতে চাইনে যে, ভারত-রুশ মৈত্রী কারও অনভিপ্রেত। দুই দেশের অনেকেই চান, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্থায়ী মৈত্রী গড়ে উঠুক। স্থায়ী মৈত্রী যদি গড়ে তুলতে হয়, তার আগে মৈত্রীর বর্তমান ভিত্তিটিকে বিচার করে দেখা দরকার।

রাশিয়ায় গিয়ে ভারতবর্ষের দুটি মাত্র মানুষের নাম আপনি অনবরত শুনতে পাবেন। নেহরু—রাজকাপুর; নেহরু—রাজকাপুর; নেহরু—রাজকাপুর। দোকান-কর্মচারী, অল্পবয়সী মেয়ে, পুলিশ-কনস্টেবল—সকলে মিলে ঐ দুটি নাম জপছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে কাদের নাম শুনতে পাবেন? মুল্‌ক রাজ আনন্দ, খাজা আহমদ আব্বাস, জৈনেন্দ্রকুমার আর ভবানী ভট্টাচার্য। তা সাহিত্যিক হিসেবে এ-দেশে এঁদের আসন কি খুব উঁচুতে? মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের "গোরা"র রুশ অনুবাদ নাকি এক সপ্তাহেই নিঃশেষ হয়েছিল। কিন্তু

তারপর কতদিনের মধ্যে তার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, কেউ তা আমাকে জানায়নি। অথচ, একটু আগেই যে চারজনের নামোল্লেখ করেছি, অনবরত তাঁদের বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। রাশিয়ার মানুষদের কাছে রাজনীতি সাহিত্য আর সিনেমা-শিল্পের ক্ষেত্রে, সুতরাং কোন্ মানদণ্ডে আমাদের পরিচয়, এর থেকেই তা বুঝতে পারবেন। এবং এই পরিচয়ের ভিত্তিতেই কি দুই দেশের স্থায়ী মৈত্রী গড়ে উঠবে? ভিত্তিটা খুব নির্ভর-যোগ্য নয়।

*　　　*　　　*

বলেছি, নির্ভরযোগ্য নয়। পরিচয়ের ক্ষেত্র তিনটিকে এবারে বিচার করে দেখা যাক। প্রথমে রাজনৈতিক পরিচয়। শ্রীনেহরু যে নিরপেক্ষ নীতির কথা বলেন, তার মধ্যে ঈষৎ অনচ্ছতা রয়েছে। বিদেশীরা তাতে বিভ্রান্ত বোধ করে থাকেন। তাঁর বিবিধ ঘোষণা আমি সযত্নে পাঠ করি। আমিও তাঁর নীতির তাৎপর্য পুরো বুঝতে পারিনি। রাশিয়ার জনসাধারণ যে আমার চাইতে বেশী বুঝতে পেরেছে, এমন কথাও আমি মনে করিনে। ভারত-রুশ মৈত্রী, আলোচ্য ক্ষেত্রে অন্তত,

[illegible] উপরেই গড়ে উঠেছে। শ্রীনেহরুর শান্তি-প্রচেষ্টা যে ব্যাপক সমাদর পেয়েছে, তাতে অবশ্য সন্দেহের হেতু নেই। এইটেই স্বাভাবিক। রাশিয়ানরা যত কাছে গিয়ে যুদ্ধের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করেছে, তত কাছে বোধ হয় আর কেউই যায়নি। সুতরাং স্বভাবতই তারা শান্তিকামী। তাই বলেই রাশিয়ায় যারা আপনার কাছে এসে গদগদ কণ্ঠে—যে-রকম গদগদ কণ্ঠে আর সবাই "ডার্লিং" অথবা "লাভ্" কথাটি উচ্চারণ করে থাকে—"নেহরু"র নামোচ্চারণ করবে, শ্রীনেহরুর রাজনীতিকে উপলব্ধি করবার মত সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধি যে তাদের আছে, এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনে। শ্রীনেহরুর রাজনীতি অতটা সহজ-সরল নয়। বরং বলতে পারি গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয়ে তাঁর রাজনীতি অত্যন্তই জটিল। খানিকটা অস্পষ্টও।

রাজনৈতিক ব্যাপারে আরও স্পষ্ট উপলব্ধির উপরে যদি এই দুই দেশের মৈত্রী গড়ে উঠত, তাতেই কি আমি খুশী হতুম? না। তার কারণ দুটি দেশের মধ্যে পুরোপুরি রাজনৈতিক মৈত্রী সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে সেই দুই দেশের শক্তিতে যদি প্রচণ্ড অসাম্য থাকে। রাশিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যেমন রয়েছে। যে-দেশ দুর্বল, তার

পররাষ্ট্র-নীতি খানিকটা পর্যন্ত কোনও শক্তিশালী দেশের পররাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে একই পথে অগ্রসর হতে পারে। তারপরেই তাদের পথান্তর ঘটতে বাধ্য। এবং তারও পরে দেখা যায়, গান আর স্লোগানের সাহায্যে যে মৈত্রী গড়ে তোলা হয়েছিল, তা শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে এখন গুরুতর মতভেদ বর্তমান। আবার ইংরেজদের অনেকেই মনে করেন যে, ফ্রান্সের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে মিশরে গিয়ে হানা দেওয়াটা তাঁদের পক্ষে একটা মারাত্মক রকমের বোকামি হয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমি বলব, এই তিন দেশের মধ্যে যে গভীর সম্প্রীতি বর্তমান, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক-আধটা ব্যাপারে মতবৈষম্য দেখা দিলেও তার অবসান ঘটবে না, কেন না, সেই সম্প্রীতির ভিত্তি নিতান্ত রাজনৈতিক নয়।

*   *   *

ভারতীয় সাহিত্যের কোন্ অংশের প্রতি রাশিয়ার আগ্রহ, স্বচক্ষেই তা দেখলাম। সেই আগ্রহের মূলে যে রাজনৈতিক প্রচারকার্যের খানিকটা হাত ছিল, এ-কথা আমার অকারণে

মনে হয়নি। **অনুবাদের জন্য ভারতীয় গ্রন্থ নির্বাচনের ব্যাপারে** অন্যথায় অন্য **রকমের** রুচিবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত। অগ্রগণ্য ভারতীয় সাহিত্যিকদের বাদ দিয়ে রাশিয়া যে শ্রীযুক্ত আব্বাসের বইকে বেছে নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই তার সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে নয়। নির্বাচিত অন্যান্য লেখকদের সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে। আনন্দ-আব্বাস গোষ্ঠীর স্বপক্ষে অবশ্য একটি কথা বলা যেতে পারে। তাঁরা ইংরেজীতে লেখেন এবং ইংরেজী থেকে তর্জমা করিয়ে নিতে রাশিয়াকে তেমন বেগ পেতে হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি সবিনয়ে জানাব যে, রাজনৈতিক বিবেচনাটাই এক্ষেত্রে আমার প্রধান বলে মনে হয়। নিজে আমি ভারতীয়, অথচ এইসব লেখকের সাহিত্যের সঙ্গে রাশিয়ানদের চাইতে আমার পরিচয় অনেক কম। এঁরা যে প্রতিভাবান লেখক নন, এমন কথা আমি বলতে চাইনে। এমন দু-একজন সমালোচককে আমি জানি, এঁদের কারও-কারও রচনায় যাঁরা অল্পবিস্তর নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু সেইসব সমালোচককেই আবার বলতে শুনেছি যে, অকমিউনিস্ট দেশের জনজীবন সম্পর্কে রাশিয়ানদের মনে যে-ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে, এঁদের রচনায় নাকি মোটামুটি তার সমর্থন পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতার কারণে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে

যদি রুশ জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেওয়া হয় ত তার চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে।

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্যকে রুশ জনসাধারণের কাছে পেশ করা হয় না। তাতেও দুঃখ হত না যদি দেখতাম যে, শ্রেষ্ঠ রুশ সাহিত্যকে ভারতীয় জনসাধারণের কাজে পেশ করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এ-ক্ষেত্রেও হয়ত রাজনৈতিক মতবাদটাই সাহিত্যবুদ্ধির চাইতে প্রবল হয়ে উঠেছে। ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস থেকে সোভিয়েট সাহিত্যের ঝুড়ি-ঝুড়ি নিদর্শন এদেশে পাঠানো হয়ে থাকে; কিন্তু রুশ সাহিত্য সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য এখনও আমাদের সেই গার্নেট আর নিউ পেঙ্গুইনের তর্জমার উপরেই নির্ভর করতে হয়। অন্তত এই কাজটা ত রাশিয়ানদের দ্বারা আর-একটু ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারত। সম্প্রতি কোথায় যেন পড়লাম, গ্রেহাম গ্রীনের "দি কোয়ায়েট আমেরিকান"। বইখানাকে যাতে রুশ ভাষায় তর্জমা করা হয়, মিঃ বার্জেস তার জন্য রাশিয়ানদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ নাকি রক্ষিতও হবে। মিঃ বার্জেস অত্যন্তই সৎ পরামর্শ দিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য সাহিত্যের কোন্ কোন্ গ্রন্থকে তর্জমা করা হবে, সে-বিষয়ে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ

পাব্লিশিং হাউসকে এই রকমের পরামর্শ দেবার মত লোক সেখানে নেই। মস্কোতে থাকতে এক উর্দু অনুবাদকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। পরমাণু-শক্তিকে কিভাবে কল্যাণ-মূলক কাজে লাগান যেতে পারে, সে বিষয়ে অত্যন্তই জটিল একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকে তিনি এখন উর্দু ভাষায় তর্জমা করছেন। উর্দু ভাষায় কে সেই বই পড়তে যাবে? এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শুধু খারাপ দিকটাকেই রাশিয়ানরা উপলব্ধি করতে পারে। বহির্জগতের মনের সঙ্গে তার পরিচয় নিশ্চয়ই তার চাইতেও কম। রাশিয়ানরা এ-কথার কী জবাব দেবে, তা-ও আমি অনুমান করতে পারি। তারা বলবে, বহির্জগতও ত রাশিয়ার মনকে বুঝতে চায়নি। বিলক্ষণ। কিন্তু এই স্বল্প পরিচয়ের ভিত্তির উপরে ত ভারত-রুশ মৈত্রীর ইমারত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মন-বোঝাবুঝির পালা এখনও শুরু হয়নি। তার আগে জমিটাকে আর-একটু তৈরি করে নেওয়া দরকার।

*　　*　　*

বাকী রইলেন শ্রীরাজকাপুর। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই বোধ হয় রাশিয়ার এখন সবচাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর গুণাবলীতে আমি সন্দেহ প্রকাশ করছিনে। কিন্তু তাঁকেই যদি আজ ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয়, অনেকেই আপত্তি জানাতে পারেন। আবার বলি, শ্রীযুক্ত কাপুরের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এমন-কিছু গুণ তাঁর থাকতে পারে, আর পাঁচজনের যা নেই। যদিও সে-গুণ যে কী, তা আমি জানিনে। আমি শুধু এই কথাই বলব, কোনও আমেরিকান যদি আজ বিদেশে যান এবং সেখানে গিয়ে যদি দেখেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিন ফিল্মের চতুর্থ শ্রেণীর চুটকি গান এবং সিনেমা-অভিনেতার রচিত পঞ্চম শ্রেণীর ফিল্মী কাহিনীর মানদণ্ডে সেখানে মার্কিন সংস্কৃতির বিচার চলছে, তা হলে তিনি যে কী পরিমাণ মর্মাহত হবেন, মস্কোয় গিয়ে তা আমি বুঝতে পেরেছি। একে ত শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্র-নীতির সুনাম ভাঙিয়ে আমাকে খেতে হয়েছে। তার জন্যই আমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। তারপর যখন দেখলাম যে, মস্কোর বিভিন্ন বুক-স্টলে তৃতীয় শ্রেণীর সব ভারতীয় লেখকদের বই থরে থরে সাজান রয়েছে, সে-দৃশ্যও খুব নয়নানন্দদায়ক হয়নি। কিন্তু শেষ মার খেতে তখনও বাকী ছিল। দু' পা এগোই, আর শুনি "রাজকাপুর!"

রাশিয়ানদের মুখে-মুখে এখন রাজকাপুরের নাম ফিরছে। এর কারণ অনুমান করা খুব শক্ত নয়। রাশিয়ান ফিল্ম সচরাচর বড়ই নীরস হয়ে থাকে। হবারই কথা, কেননা দেশগঠনের গুরু-গম্ভীর কথা আর নয়ত কোলখোজ্-এর দৃশ্য আর নয়ত বিখ্যাত দাবা-খেলোয়াড়দের শান্তি-আবেদন ছাড়া তাতে প্রায় কিছুই থাকে না। এইসব একঘেঁয়ে জিনিস দেখতে দেখতে রাশিয়ান দর্শকরা নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। "আওয়ারার" মত ফুরফুরে বই তাঁরা তাই পাবামাত্রই লুফে নিয়েছেন। "আওয়ারা" সেই একঘেঁয়েমির হাত থেকে তাঁদের মুক্তি দিয়েছে, তাঁরা পালিয়ে বেঁচেছেন। রাজকাপুর যে রাশিয়ায় আজ এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, এর আর অন্য কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাইনে। আগেই বলেছি, নেহরুকে রাশিয়ানরা ঠিক বুঝতে পারে না, তবুও তাঁকে তারা ভালবাসে। রাজকাপুরই বোধ হয় একমাত্র ভারতবাসী, অনায়াসে যাঁকে তারা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ভারতীয়দের এত উৎসাহ বোধের কারণ নেই।

একদিকে ভাববাদী রাজনীতি। যার অবয়ব খুব স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে ফিল্মী ভাঁড়ামি। যার অবয়ব অত্যন্তই স্পষ্ট। এর কোনওটির উপরেই রাশিয়া আর ভারতবর্ষের মধ্যে প্রকৃত

মিত্রতা গড়ে উঠতে পারে কিনা, সে-বিষয়ে আমার ঈষৎ সন্দেহ বর্তমান। নেহরু অথবা রাজকাপুর ভারতীয় জীবনের কতখানি অংশের পরিচয় রাশিয়ার মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। আমার ধারণা, মাত্রই এক অংশের। নেহরু এবং কাপুরের মাঝখানে ভারতীয় জীবনের যে ব্যাপক অংশ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, রাশিয়ার মানুষরা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারও খানিকটা পরিচয় পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত-রুশ মিত্রতার সূত্রপাত হবে না। অপিচ, ভারতীয়দের পক্ষেও রাশিয়ার আর একটু নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া দরকার। আমি যদি রাশিয়ান হতুম, তা হলে ময়দানে লক্ষ মানুষের সমাবেশ দেখেই আমি নিশ্চিন্ত হতুম না। রেড স্কোয়ারে সুশৃঙ্খল পায়োনিয়ার্সদের সমাবেশ দেখেই কোনও ভারতীয়ের যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। যখন দেখব, নিছক আনন্দ-লাভের জন্যই কোনও ভারতীয় ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউসের বই পড়ছেন; যখন দেখব, রুশ এবং ভারতীয় ছেলেমেয়েদের মেলামেশা অবাধ হয়েছে; যখন দেখব, একজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে একজন রুশ ছাত্রের প্রবল বিতর্ক চলছে, প্রথমজন নেহরুকে পাক্কা অ্যারিস্টোক্র্যাট বলছে এবং দ্বিতীয় জন ক্রুশ্চেভকে ভাঁড় বলে গাল দিতেও দ্বিধা করছে না, অথবা প্রথমজন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার দোষত্রুটি এবং

দ্বিতীয়জন রুশ সমাজ-ব্যবস্থার দোষত্রুটি নিয়ে নির্ভয়ে আলোচনা করছে, একমাত্র তখনই আমি বুঝব যে, রুশ-ভারত মিত্রতার বনিয়াদ আর ধসে পড়বার ভয় নেই। ঠিক এইরকমের মিত্রতা ত একাধিক দেশের সঙ্গে আমাদের রয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গেই বা অন্য রকমের মিত্রতা হতে যাবে কেন। সাধারণ মানুষ ত নেহরু আর বুলগানিনের সান্নিধ্যে থাকে না। সাধারণ মানুষ ত রাজকাপুর আর মস্কো ডায়নামোর থেকে দূরে থাকে। রাশিয়া আর ভারতবর্ষ যদি পরস্পরের মন বুঝতে চায়, পরস্পরকে ভালবাসতে চায়, সাধারণ মানুষের নিভৃত লোকালয়েই তাদের বন্ধুত্বের বীজকে তাহলে বপন করতে হবে।

পোট্রি এবং টয়্নবি

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনায় বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যেই ইতিহাসের উপকরণ বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে? আমি অন্তত তা-ই মনে করি। সর্বাংশে যদিও করি না। আমার বিশ্বাস উপকরণ সংগ্রহের জন্য সভ্যতার শরীরে যদি অনুসন্ধান চালান হয়, শেষ মীমাংসায় আমরা না-ও পৌঁছতে পারি। আসল কথা, মীমাংসার চূড়ান্ততায় আমার আস্থা নেই। সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দেশ যে কতখানি কঠিন কাজ, দুই সভ্যতার পার্থক্য নির্দেশ যে কতখানি দুরূহ, এবং সৃষ্টির লক্ষণকে ধ্বংসের লক্ষণ থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা আমি জানি। তৎসত্ত্বেও টয়্নবির প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া যাক। তার কারণ কমিউনিজম যে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, টয়্নবি প্রস্তাবকে গ্রহণ করলে তার প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ত পেলেও পেতে পারি। এই খানে একটা প্রশ্ন উঠবে। আজ থেকে একশ বছর পরে, ভবিষ্যতের টয়্নবি কি সোভিয়েট সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নেবেন? অসম্ভব নয়। ওয়েব-দম্পতি আশা করতেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় এক বলিষ্ঠ

এবং নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটবে। অতখানি আশাবাদী হবার দরকার নেই। এমন কথা বলবার এখনও সময় আসেনি যে, বাইজানটাইন ঐতিহ্য নিঃশেষে মুছে গিয়ে সেখানে এক নতুন মানব-সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। তা এখনও হয়নি। আপাতত এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, লেনিন আর স্ট্যালিনের প্রয়াসে রাশিয়ায় এক নববিধান গড়ে উঠেছে। প্রাচীন বিধানের সঙ্গে তার খুচরো কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলেই তার চারিত্রিক নবীনতায় কেউ সন্দেহ না করেন। উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের জন্য রাশিয়াতেও অবশ্য শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয়। লেখকরাও সেখানে প্রভূত অর্থ পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাতেই কিছু কমিউনিজম আর ক্যাপিটালিজ্‌মএর পার্থক্য ঘুচে যায় না। কমিউনিজমকে আমরা একটি নূতন দর্শন, নূতন ধর্ম হিসেবে গণ্য করতে পারি। বিশ্বমানবকে এক নববিধানের মধ্যে এনে সমবেত করাই যার উদ্দেশ্য। সোভিয়েট সভ্যতাকে তাই বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

সোভিয়েট সভ্যতা আজ কোন্ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে? উত্তর দেবার আগে পেট্রি আর লিগেটির নামোল্লেখ করব। এঁদের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সরোকিনের ভাষা

হল, "প্রতিটি সংস্কৃতিকেই প্রধান তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। স্থাপত্য, ললিতকলা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্প।" স্থাপত্যের কাজ রাশিয়ায় এখন কতখানি ব্যাপকভাবে চলছে, ইতিপূর্বে আমি তার উল্লেখ করেছি। পাঠকের তা মনে থাকতে পারে। টাউন হল, পাবলিক পার্ক, পায়োনিয়ার্স প্যালেস, স্টেট থিয়েটার—স্থাপত্যকলার অসংখ্য নিদর্শন সেখানে গড়ে উঠেছে। এবং রাতারাতি গড়ে উঠছে। স্থাপত্যকলা সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান আমার নেই যে, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে সোভিয়েট স্থাপত্যে তেমন কোনও উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় আমি পাইনি। তার ধাঁচ খানিকটা ভিক্টোরীয়। সেইসঙ্গে আয়তন-গত বিপুলতার প্রতিই তার পক্ষপাত। সৌন্দর্যের দিকে ততটা নয়, যতটা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে—দৃষ্টান্ত হিসেবে মেট্রো স্টেশনগুলির উল্লেখ করতে পারি—অবশ্য মনে হয়েছে, সৌন্দর্য সৃষ্টির দিকেও স্থপতির লক্ষ্য কিছু কম ছিল না। কিন্তু মুষ্টিমেয় অতিশিক্ষিতের মধ্যেই তার আবেদন সীমাবদ্ধ নয়, জনরুচির তৃপ্তিসাধনই তার উদ্দেশ্য। "চিত্রকলার অনধিক একটি মানুষের বাণীই আমরা শুনতে পাই। আর স্থাপত্য-কলায় একইসঙ্গে অনেকের কণ্ঠ যেন সমস্বরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।" রাশিয়ায় এখনও একক শিল্পীর প্রাধান্য ঘটেনি। "মিলিত,

সমবায়ী কর্মোদ্যোগই” সেখানে আপনি দেখতে পাবেন। “সেই সমবায় শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়। একাধিক ক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে যুগের। মধ্যযুগীয় গির্জাগুলিই তার দৃষ্টান্ত।” এর থেকে মনে হতে পারে, সোভিয়েট সভ্যতার এখন প্রথম পর্যায় চলছে। পেট্রি অন্তত এই সিদ্ধান্তেই আমাদের পৌঁছে দেবেন।

* * *

সিদ্ধান্তটাকে যে মেনে নিতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। (পাঠকদের পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেব খানিকটা পূর্ব-সিদ্ধান্ত এবং খানিকটা অনুমানের উপরে নির্ভর করে আমরা এই বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছি; অকাট্য কোনও সিদ্ধান্তে আমরা না-ও পৌঁছতে পারি।) এমন নয় যে, প্রতিটি সভ্যতাই পূর্বোক্ত তিনটি সাংস্কৃতিক পর্যায় অতিক্রম করতে পারে। মানুষমাত্রেই যেমন যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য অতিক্রমে সমর্থ হয় না। টয়্নবি বলছেন, সভ্যতা অনেক সময় রুদ্ধগতি হয়ে পড়ে। এমন সম্ভাবনাকে (সম্ভাবনা মাত্র) উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, সোভিয়েট সভ্যতার অগ্রগতিও হয়ত মধ্যপথেই

রুদ্ধ হবে। তার কোনও নিশ্চিত লক্ষণ যদিও দেখা দেয়নি। আকস্মিক কোনও বিপর্যয় যদি না ঘটে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রগতিবেগ আরও অনেক কাল হয়ত অব্যাহত থাকবে। কিন্তু মনে কববার হেতু বর্তমান, সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন "সঙ্কটকাল" চলছে। যে-মহাজিজ্ঞাসার সে আজ সম্মুখীন হয়েছে, ঠিকমত তার জবাব দিতে পারলে তার প্রগতি হয়ত আরও ত্বরান্বিত হবে। না দিতে পারলে অবক্ষয়কেই সে ডেকে আনবে। সম্ভাবনার পাল্লাটা দুদিকেই এখন সমান। কী জবাব সে দেয়, তার উপরেই তার ভবিষ্যৎ আজ নির্ভর করছে।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেই সোভিয়েট মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। স্ট্যালিনের মৃত্যু মাত্রই একবার ঘটেনি। ঘটেছে দুবার। একবার ১৯৫৩ সনে, আর একবার বিংশ কংগ্রেসে। নিজের ভাষায় যদি স্ট্যালিন-চরিত্রের বিচার করতে বসি, আলোচনার পরিধি অত্যন্তই বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে। তার চাইতে বরং টয়্‌নবিরই শরণ নেওয়া যাক। টয়্‌নবির মতে স্ট্যালিন ছিলেন "অস্ত্রধারী ত্রাণকর্তা"। তাঁর তলোয়ারকে তিনি কদাচ কোষবদ্ধ করেন নি। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসাধকদের—"মার্জারের মৃত্যুতে উৎফুল্ল

ইতুরগোষ্ঠী"র সঙ্গেই যাঁদের তুলনা চলে—সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। এক, স্ট্যালিনের তলোয়ারকে আর কোষবদ্ধ না করে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিনা দ্বিধায় তার ব্যবহার। অর্থাৎ স্ট্যালিন স্বয়ং যে আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং বেঁচে থাকলে তিনি নিজেও যা করতেন। দুই, তলোয়ারটিকে কোষবদ্ধ করা এবং তার অস্তিত্বকে বেমালুম বিস্মৃত হওয়া। দ্বিতীয় পন্থাটিকেই ক্রুশ্চেভ বেছে নিয়েছিলেন। তলোয়ারকে শুধু কোষবদ্ধই তিনি করেননি, তার অস্তিত্বকেও তিনি ভুলে যেতে চেয়েছিলেন। পোল্যাণ্ড আর হাঙ্গারিতে যখন গোল-যোগের সূত্রপাত হল, ক্রেমলিনের প্রাথমিক আচরণে তখন যে দৃঢ়তার অভাব দেখা গিয়েছে, তাতে অন্তত তা-ই মনে হয়। এখন যা দেখতে পাচ্ছি, তা হয়ত "আভ্যন্তর প্রোলেতারিয়ার" অভ্যুত্থান বলেই গণ্য হবে। এ-অভ্যুত্থানকে দীর্ঘকাল ধরে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। স্বপ্নবিলাসীরা যতদিন সম্ভব বলে মনে করেন, তার চাইতে দীর্ঘতর কাল। আবার এমনও অসম্ভব নয় যে, এই অশান্তির আগুন আরও অনেক জায়গায় প্রসারিত হয়ে পড়বে এবং তার শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটবে। রাশিয়া এখন কী মনোভাব দেখায়, তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

* * *

প্রকৃত অবস্থার যে-আভাস আমি দিয়েছি, তার সমর্থনে বিকল্প আর কোন্ প্রমাণ আমি উপস্থাপন করতে পারি? সমাজদেহে ভেদবুদ্ধির প্রসার এবং সামাজিক রীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে গোঁড়া রক্ষণশীলতা। যে-সভ্যতার মৃত্যু ঘটেছে, একমাত্র তার দেহেই এ-সব রোগের লক্ষণবিচার সহজে সম্ভব। আমি ত মৃত সভ্যতাকে বিচার করতে বসিনি। জীবন্ত সভ্যতাকেই আমি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। সুতরাং রোগনির্ণয়ে আমার ত্রুটি ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে। সে আশঙ্কা যৎসামান্য নয়। তবু বলি, সোভিয়েট রাশিয়ার সম[illegible] প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি যে অন্ধ অনুরক্তি বর্তমান, একমাত্র অন্ধেরই তা চোখ এড়িয়ে যাবে। পাঠক এ-কথা সহজে বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তার কারণ, যে-দেশের সম্পর্কে এই বিরূপ মন্তব্য আমি করেছি, কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে সে-দেশ অত্যন্তই উন্নত; অন্যান্য আর পাঁচটা ব্যাপারেও তার অধিবাসীদের উদ্দীপনা প্রায় অন্তহীন। পাঠককে, সুতরাং, ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের কথা স্মরণ করতে বলব। তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে, যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজ-জীবনে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে একটি দেশের পক্ষে কতখানি পিছিয়ে থাকা সম্ভব। এ-দুয়ের মধ্যে আসলে কোনও বিরোধ নেই। কে

জানে, এই অবস্থাই হয়ত স্বাভাবিক। যে-দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে, নিত্য-নূতন যন্ত্র এবং কারিগরী পদ্ধতির যেখানে প্রবর্তন হচ্ছে, সামাজিক জীবনে সে-ই হয়ত পুরনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ড অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। অথচ চিন্তার ক্ষেত্রে সে যে অন্ধ মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা হয় না। সোভিয়েট রাশিয়া আধুনিক দেশ। কিন্তু সামাজিক নীতিরক্ষার ব্যাপারে ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডকেই সে হার মানিয়েছে। খুব কম মেয়েকেই সেখানে আমি প্রকাশ্যে ধূমপান করতে দেখেছি। বাড়ীতে বসে ধূমপান করেন, এমন মেয়ের সংখ্যাও সেখানে বেশী নয়। কোনও মেয়ে পাব্‌এ বসে মদ খাচ্ছে, এমন দৃশ্য চোখে পড়লে স্বয়ং ভিক্টোরিয়া যে-পরিমাণ মর্মাহত হতেন, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি তার চাইতে কম মর্মাহত হবে না। এবং বিবাহের আগে কাউকে ভালবাসা অথবা বিবাহের পরেও অন্য কাউকে ভালবাসা সেখানে বুর্জোয়া ভ্রষ্টতা বলে গণ্য হয়ে থাকে।

ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ড আর আধুনিক রাশিয়ার মধ্যে তাই বলে কি কোনও পার্থক্য নেই? পার্থক্য অসংখ্য। আর তা ছাড়া, সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপারে, অন্ধ রক্ষণশীলতার ফলে

এককালে ইংল্যাণ্ডের কী হয়েছিল, তার থেকে আজকের রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ণয় সম্ভব নয়। তবু বলি, সামান্য কয়েকটি ব্যাপারে এদের মিল আছে। সে-মিল আমার প্রত্যাশিত ছিল না। রাশিয়াকে দেখে এখন বুঝলাম, [illegible] ক্ষেত্রে প্রাগসরতা সত্ত্বেও—হয়ত সেই কারণেই—চিন্তায় এবং সামাজিক জীবনে রক্ষণশীল হওয়া সম্ভব। (ভারতবর্ষেও ত আজকাল এই অনুদার রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে অগ্রগতি ঘটেছে, এই রক্ষণশীলতা তারই পরিণাম নয়ত?) সোভিয়েট সমাজের এখন প্রধান লক্ষ্য, সমস্ত কিছুকে কী করে জনসাধারণের কাজে লাগান যায়। এমন কিছুকে তারা মূল্য দেয় না, যা দিয়ে জনহিতের সম্ভাবনা নেই। সাফল্য আর সমৃদ্ধিকেই তারা সর্বাধিক মূল্য দেয়। তাদের উদ্দেশ্য মনোহরণ নয়, হিতসাধন। মনোহরণের এক-আধটা প্রয়াস যদি বা দেখা যায়, সে প্রয়াস অত্যন্তই সোচ্চার, অত্যন্তই জমকালো। কেননা, তারও লক্ষ্য জনরুচি। মেট্রো স্টেশনই তার একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। রাশিয়ায় গিয়ে প্রায় সর্বত্রই একটা সায়-দেওয়া মনোভাব লক্ষ্য করেছি। কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ, এ-বিষয়ে পার্টির কথাই চূড়ান্ত। পার্টি থেকে যে-সব নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কেউই তার বাইরে যেতে চায় না। ভুলতে চায় যে, তার বাইরেও

কিছু-কিছু নিয়ম থাকতে পারে। নিয়মের প্রতি এই অন্ধ অনুরক্তির ফলেই রাশিয়ার সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে একটা নিরানন্দ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। যা কারও চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। জীবনের একটা স্থির উদ্দেশ্য থাকা ভাল। তার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু জীবন যেন উদ্দেশ্যসর্বস্ব হয়ে না ওঠে।

* * *

রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনে ইদানীং কিছু বিভেদপরায়ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতই স্পষ্ট যে, তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার দরকার করে না। যে-সব দেশের শক্তি রাশিয়ার চাইতে কম, তাদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুটি নীতি রাশিয়া অবলম্বন করতে পারত। কঠোর অথবা নরম। যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, এ দুয়ের কোন্‌টি যে ফলপ্রসূ হবে, সে বিষয়ে ক্রেমলিন প্রথমটায় মনঃস্থির করে উঠতে পারেনি। ক্রেমলিনের বোঝা উচিত ছিল, দুটি নীতির যদি মিশ্রণ ঘটান হয়, তাতে করে পৃথিবীর দুই প্রান্তেই সমালোচনার ঝড় বইবে। পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতবর্ষই বোধ হয় সব-

চাইতে সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ক্রেমলিন যেন দীর্ঘকাল তার উপরে নির্ভর না করে। বহির্জগৎ থেকে যে-সব টুকরো খবর এসে পৌঁছচ্ছে, তাতে মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন এক নূতন উদারনীতির হাওয়া বইছে।* এমন-কিছু রাশিয়ানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, এই প্রশস্তি-বাচনে যাঁরা খুশী হয়েছেন। আমি যদি রাশিয়ান হতুম, অথবা কমিউনিস্ট, এত সহজে খুশী হতুম না। খুশী হবার আগে বুঝতে চাইতুম, এই উদারনীতির পিছনে কোনও অভিসন্ধি আছে কি না। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই যদি আমার লক্ষ্য হত, এই সব শুভসংবাদকে আমি সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে দেখতুম।

কথাটা স্বীকার করা ভাল যে, সোভিয়েট রাশিয়া তার অগ্রগতির পথে আজ এক অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। তাকে এখন এগিয়ে যেতে হবে, অথবা পিছিয়ে। থেমে দাঁড়াবার উপায় তার নেই। কোন্ পথে সে যাবে? ঐতিহাসিক জ্যোতিষী আমি নই। সুতরাং উত্তরটা আমার অজ্ঞাত। স্ট্যালিন যে কঠোর নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তা কি এখন ফলপ্রসূ হবে? জানি না। ক্রুশ্চেভ যে নরম নীতির পক্ষপাতী, তাতেই কি সুফল ফলবে? তা-ও আমি

জানি না। আমি শুধু এইটুকুই জানি যে, দুই নীতির যদি মিশ্রণ ঘটান হয়, ক্রেমলিন তাহলে বিপদে পড়বে। আর একটা কথা। সঙ্কট থেকে শুধু অশুভেরই জন্ম হয় না। শুভেরও হয়। রাশিয়া আজ সঙ্কট-কালের সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে তার অবক্ষয় দেখা দিতে পারে। আবার এই সঙ্কটের মধ্য থেকেই এক নবজীবনের সৃষ্টি হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

ক্ষণায়ু বসন্ত

আমি যেদিন মস্কো পৌঁছই, তার আগের দিনও সেখানে প্রচণ্ড শীত গিয়েছে। মস্কো থেকে যেদিন চলে আসি, তার পরের দিনই আবার প্রচণ্ড শীত পড়ল। শুধুই শীত নয়, সেই সঙ্গে বৃষ্টি এবং তুষারপাত। পাঠক আশা করি বুঝতে পারবেন, মস্কো-আবহাওয়ার খবর বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, এই বিবৃতির মধ্যে আর একটি ইঙ্গিত আমি দিতে চেয়েছি। এবং একটি প্রশ্নও তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। রাশিয়ায় গিয়ে যে নির্মেঘ আবহাওয়া আমি পেয়েছিলাম, তা কি একান্তই ক্ষণায়ু? আমার এই শেষ নিবন্ধের শিরোনামাতেও সেই একই প্রশ্ন আমি তুলে ধরেছি। প্রসঙ্গত জানাই, রাশিয়ার উপরে এই নিবন্ধমালা আমি অনায়াসে লিখতে পারিনি। দেখা এবং লেখার মধ্যবর্তীকালে আরও অনেক কিছু ঘটেছে। এই নিবন্ধমালায় যার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তা ছাড়া, সারাক্ষণই আমার মনে হয়েছে যে, রাশিয়ার প্রতিপক্ষ আমেরিকায় যে যায়নি, রাশিয়া সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত অভিমত দেবার অধিকার তার নেই। কাবুল থেকে তাসকেন্ত অনেক ভাল শহর, কিংবা শাজাহান-

পুরের চাইতে তারমিজে অনেক বেশী ট্যাক্সি আছে, এ-সব কথা বলবার কোনও মানে হয় না। হয় না এই কারণে যে, সাম্যবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদের কোনও তুলনা যদি টানতেই হয় ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে তার আগে দেখে নেওয়া দরকার। এখনও তা আমি দেখিনি।

আমি যখন রাশিয়ায় যাই, তার আগেই সেখানে হাওয়া-বদল শুরু হয়েছে। ফলত, যে-পরিচয়ে রাশিয়াকে সবাই জানে, সেই বিশেষ পরিচয়ে তাকে জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রায়া অবশ্য কদাচ স্বীকার করেনি যে, সোভিয়েট আবহাওয়ার আদৌ কোনও পরিবর্তন ঘটেছে, অথবা রাশিয়ায় আজকাল যেটুকু স্বাধীনতা দেখতে পাওয়া যায়, স্ট্যালিনের আমলে তা ছিল না। রায়া আমাকে বোঝাতে চেয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ার আবহাওয়া এর আগেও ঠিক এই রকমই ছিল। তাকে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে তার উক্তিতে আর কিছু না থাক—পার্টির প্রতি অনুরক্তির পরিচয় ছিল, এমন কথাও আমি মনে করিনে। তার কারণ, পার্টি নিশ্চয়ই দাবি করবে, বিংশ কংগ্রেসের পরে সোভিয়েট-ভূমির আভ্যন্তর অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। আমারও তা-ই বিশ্বাস। ক্রেমলিনে গিয়ে দেখি, আমেরিকান ট্যুরি-

স্টরা সেখানে অবাধে ফটো তুলছেন। বছর দুয়েক আগে কি সেটা সম্ভব হত? কোনও ভারতীয় যদি রাশিয়ায় যেতে চান, চাইবামাত্রই তিনি ভিসা পেয়ে যাবেন। (সোভিয়েট রাশিয়ার কোথায়-কোথায় আপনাকে যেতে দেওয়া হবে, ভিসায় অবশ্য তার উল্লেখ থাকবে। অন্যান্য দেশের ভিসায় এত কড়াকড়ি করা হয় না।) আগের আমলে কি পাওয়া যেত? স্বদেশের এবং বিদেশের মানুষদের সম্পর্কে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এতকাল যে কঠোর নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, ইদানীং তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে সন্দেহ করিনে। এ-পরিবর্তনের কারণ কী? বহির্জগৎ এখনও তার উত্তর খুঁজে মরছে।

* * *

স্ট্যালিনী আমলের প্রতি রায়ার অচলা ভক্তি। যতই তাকে বোঝান হক না কেন, সে-আস্থা নষ্ট হবার নয়। রাশিয়ায় ইদানীং যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে, রায়ার মনোভাবের মধ্যেই তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। এতকাল সে জেনে এসেছে, স্ট্যালিন অভ্রান্ত, তাঁর কোনও ভুল হতে

পারে না। আজ যদি তাকে বোঝান হয় যে, স্ট্যালিন কিছু দেবতা ছিলেন না, বিশ্বাস করা তার পক্ষে স্বতই শক্ত হবে। এবং রায়াদের সংখ্যা নিতান্ত সামান্যও নয়। এতকাল তারা স্ট্যালিনী ব্যবস্থার জিন্দাবাদ দিয়ে এসেছে। ক্রুশ্চেভের নিন্দা-বাদে তারা প্রীত হয়নি। ক্রুশ্চেভ ইদানীং স্ট্যালিনী পন্থার যে কঠোর সমালোচনা করেছেন, রাশিয়ার মানুষকে তার পূর্ণ বিবরণ জানান হয়েছে কিনা, তা আমি জানিনে। রায়া বলেছে, বিংশ কংগ্রেসের সমস্ত খবরই সে রাখে। কিন্তু রায়ার কথাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। সে যা-ই হক, রাশিয়ায় গিয়ে যাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তাঁদের অনেকেই দেখেছি স্ট্যালিনের সমালোচনায় খুব উৎ-সাহী নন। স্ট্যালিনের পক্ষেও যে ভুল করা সম্ভব, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কেউ-কেউ তা মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁদের বলতে শুনেছি, "তাই বলে স্ট্যালিনের সাফল্যকে ত আর অস্বীকার করা যায় না।" একজন গাইড ত আমাকে স্পষ্ট বলল, "রাশিয়ায় এসে যা-কিছু আপনারা দেখছেন, তা স্ট্যালিনেরই তৈরী।" কথাটাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। স্ট্যালিনের উত্তরসাধকদের কর্মসাফল্যের কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। শুনেছি, ক্রুশ্চেভ নাকি রাশিয়ার নানান অঞ্চলে পতিত জমিতে সোনা ফলিয়েছেন। কিন্তু সে-

সব আমাদের দেখান হয়নি।

অবশ্য চিন্তা-স্বাধীনতার যে আলোক-শিখাটিকে নির্মম হাতে স্ট্যালিন নিভিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিন আবার যদি তাকে জ্বালিয়ে তুলে থাকেন, তার মূল্যও অসামান্য। কিন্তু সত্যিই কি সে-আলো তারা জ্বালিয়েছেন? জ্বালালেও কতদিনের জন্য? রাশিয়ার এই বসন্ত ক্ষণায়ু নয়ত? প্রবন্ধের সূচনাতেই প্রশ্নটা আমি তুলেছি। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন কি রাশিয়ার মানুষদের অনভিপ্রেত ছিল? নয়ত স্ট্যালিনের সামান্যতম সমালোচনাও রায়া শুনতে চায়নি কেন? আর একটা কথা। ন্যাশনাল হোটেলের বুক-স্টলে ম্যালেনকভ এবং মিকোয়ানের বক্তৃতার কপি কিনতে পাওয়া যায়। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার কপি সেখানে পাইনি। কেন পাইনি? অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, স্ট্যালিনী আমলে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহভাজন একটা কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। এতকাল তারা নানান রকমের সুবিধে পেয়ে এসেছে। এখন যদি সেই সুবিধেগুলিকে কেউ কেড়ে নিতে চায়, প্রাণপণে তারা বাধা দেবে। ইস্কুলে-ইস্কুলে অবশ্য নতুন কালের মানুষ তৈরী হচ্ছে। নতুন করে পাঠ্যবই লেখা হচ্ছে তাদের জন্য। ক্রুশ্চেভ কি তাদের সমর্থন পাবেন? হয়ত পাবেন। আরও কয়েক বছর সময় যদি তিনি পান। সময় তিনি না-ও পেতে পারেন।

ক্রুশ্চেভ যে-সব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, অনেকেরই তা মনঃ-পূত হয়নি। না-হওয়ার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি দেখান যেতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন, ক্রুশ্চেভের উদারনীতির ফলেই রাশিয়ার ঘরে-বাইরে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বলতে পারেন, ভবিষ্যতে কী হবে, কেউই তা জানে না; যা হতে পারে, তা বাঞ্ছনীয় নয়। পোল্যাণ্ডে আর হাঙ্গারিতে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটেছে। তারপর এমন সব গুজব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, রাশিয়ার ছাত্রমহলও নাকি ক্রুশ্চেভী নীতিতে খুশী হয়নি; মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষের উত্তাপ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। সমাজদেহেও এই উদারনীতির পরিণাম সর্বাংশে শুভ হয়নি। রেড স্কোয়ারের আশেপাশে এমন কিছু ছেলে-ছোকরা আজকাল দেখতে পাওয়া যাবে, তেরছা করে যারা টুপি পরে, ঠোঁটের কোণায় সিগারেট ঝুলিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখে, আর যা-ই হক, পার্টির সদস্য বলে মনে হবে না। শুধু কি তা-ই, রাশিয়ায় কিছু কিছু মেয়ে আজকাল সতৃষ্ণ নয়নে বিদেশীদের জমকালো পোশাকের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মতন যে-সব মানুষ রাশিয়ায় বেড়াতে যান, স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে তাঁদের উপস্থিতির প্রভাব সত্যিই খুব শুভ হয় না। তারা ভাবে, এ-লোকটা ত দিব্য সুইস কার্ডিগান পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অথচ আমরা এ-সব

জিনিস ছুঁয়েও দেখতে পারিনে। তারা ভাবে, এ-লোকটা ত বেশ ট্যুরিস্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ আমরা ত কই বিদেশে যাবার সামর্থ্য রাখিনে। নানান দেশ থেকে প্রকাশিত একগাদা বই আর পত্র-পত্রিকা আমার সঙ্গে ছিল। রাশিয়ার মানুষ তা দেখেছে। দেখে তারা না-ভেবে পারেনি যে, চার পৃষ্ঠার প্রাভদা এবং মার্ক্স-লেনিনের অনুমোদিত সামান্য-কিছু বইপত্র পড়েই তাদের তৃপ্ত থাকতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যদি মনে করে যে, বিদেশীরাই তাদের দেশে গিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে আসে, পার্টিকে তা হলে দোষ দেওয়া যাবে না। বিদেশীমাত্রেই অসন্তোষ ছড়িয়ে যায়।

ক্রুশ্চেভ হয়ত ভাবছেন, নতুন কালের মানুষকে তিনি নতুন ধারায় তৈরী করবেন। যাদের কথা তিনি ভাবছেন, এখনও তারা অল্পবয়সী। বিপ্লব সম্পর্কে তাদের বোধ খুব স্পষ্ট নয়। বিপ্লব যাঁরা ঘটিয়েছিলেন, কী-পরিমাণ দুঃখ তাঁদের বরণ করতে হয়েছে, তাও তারা জানে না। আজ তারা সোভিয়েট রাশিয়ার সুখী নাগরিক। কত রক্ত, কত পরিশ্রম, কত অশ্রুর উপরে যে এই দেশ গড়ে উঠেছে, তা তারা কী করে জানবে। সুখের দিনে তারা জন্ম নিয়েছে। তারা জানে না, রাশিয়ার মানুষকে স্ট্যালিনের আমলেও অশেষ

কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছিল। এখন আর সেই কৃচ্ছ্র সাধনের কোনও প্রয়োজন নেই। আবহাওয়া এখন নির্মেঘ। পেট্রির অনুমান যদি সত্য নয়, নতুন কালের রাশিয়ানরা তাহলে স্থাপত্যের বদলে এবার ললিতকলার দিকে ঝুঁকতে পারে। সাংস্কৃতিক বিকাশের নবপর্যায়ে কেউ-কেউ হয়ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পকলার দিকেও এগিয়ে যাবে। জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশের এই [illegible] কেউ অবক্ষয়ের সূচনা বলে গণ্য না করেন। তার কারণ, মানুষের সৃষ্টিসুখ শুধু স্থাপত্যের মধ্যেই সীমায়িত হয়ে থাকে না, নবতর ক্ষেত্র সে খুঁজে নিতে চায়। শুধু তা-ই নয়, ললিতকলা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পের পর্যায়েও অনেক জাতি যে অসামান্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে, মানুষমাত্রেই তা নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে। পার্টি-সদস্যদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁরা মনে করেন, উত্তেজনা যেখানে স্তিমিত হয়ে আসে, মানুষ যেখানে সামান্য সময়ের জন্যও কাজের বল্গায় ঢিল দিতে চায়, সেইখান থেকেই তার অবক্ষয়ের সূচনা। রাশিয়ার অধিকাংশ মানুষই কি তা-ই মনে করেন? শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র তাঁরা গড়ে তুলেছেন। শুধু তাতেই কি তাঁরা তৃপ্ত থাকবেন? শক্তিশালী রাষ্ট্রকে কি তাঁরা মহান দেশে পরিণত করবেন না? যে-উত্তর তাঁরা দেবেন, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ আজ তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে।

বিবেচনা করি, রাশিয়া আজ এক দ্বিমুখী রাস্তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে, কোন্ পথ সে গ্রহণ করবে। উত্তর জানবার জন্য সমগ্র পৃথিবী আজ সাগ্রহে অপেক্ষমান। আমি শুধু অনুমানই করতে পারি। কোনও কিছুরই সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। রাজনৈতিক ফাটকাবাজদের ধারণা, ক্রুশ্চভী উদারনীতির আয়ু আর বেশীদিন নয়, এর পরেই স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের দিন আসছে। তফাত শুধু এই যে, নির্মমতার পরিমাণ এবারে আরও বৃদ্ধি পাবে। আমি ফাটকাবাজ নই। [illegible] আমার আস্থা নেই। আমার ধারণা, স্বৈরাচার যেমন কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না, (যে-সব জিনিসকে আপনি খারাপ বলে গণ্য করেন, তাকে দমন করতে করতে একসময় আপনি দেখতে পাবেন যে, যে-সব জিনিস সম্পর্কে আপনার কোনও নির্দিষ্ট ধারণা নেই, তাকেও আপনি দমন করতে শুরু করছেন। এবং দুদিন বাদে ভাল-মন্দ সব কিছুকেই আপনি নির্বিচারে দমন করতে আরম্ভ করবেন।) স্বাধীনতাও চায় না। স্বৈরাচারের মতই স্বাধীনতাও শেষ পর্যন্ত আপন গতিবেগেই এগিয়ে

চলে। রাশিয়ায় আজ যে বসন্তকালীন আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, তা যদি একান্তই ক্ষণায়ু হয়, অবশ্যই আমি বিস্মিত হব না। শৃঙ্খলার প্রয়োজনে স্বাধীনতাকে সেখানে বলি দেওয়া হতে পারে। এমন কথা বলবার হেতু এই যে, স্ট্যালিনপন্থীরা নিশ্চয়ই বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমাণ অধিকারও ছেড়ে দেবেন না। যুদ্ধটা যেখানে যুক্তির সঙ্গে গোঁড়ামির, সচরাচর গোঁড়ামিই সেখানে জয়ী হয়ে থাকে। ইতিহাসে তার অজস্র উদাহরণ রয়েছে। আর তা ছাড়া, উদারনীতি এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের ধারণাও খুব পবিত্র নয়। পক্ষান্তরে, প্রাথমিক নানা সুবিধা সত্ত্বেও, গোঁড়ামি এক্ষেত্রে অনায়াসে জয়ী না-ও হতে পারে। রাশিয়ার মানুষ একবার যখন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, তখন বিনাবাক্যে সেই স্বাধীনতাকে তারা ছেড়ে দিতে চাইবে না। স্ট্যালিনপন্থীদেরও, সুতরাং, দুশ্চিন্তার হেতু আছে।

ফলাফল যা-ই হক, মানবসভ্যতার ইতিহাসে রুশ বিপ্লব যে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যাবে, তাতে সন্দেহ করিনে। আজ যেমন ফরাসী বিপ্লবকে স্মরণ করছি, আজ থেকে একশ বছর পরে রুশ বিপ্লবকেও হয়ত ঠিক তেমনি করেই সভয় শ্রদ্ধায় আমরা স্মরণ করব। স্ট্যালিনবাদের মধ্যে থার্মিডরেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল কিনা, এবং ক্রুশ্চেভ কি যথার্থই সোভিয়েট

নরনারীর ত্রাণকর্তা না নিতান্তই মূঢ়, ২০৫৬ সনের ঐতিহাসিকই সে-বিষয়ে অভ্রান্ত রায় দিতে পারবেন। আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এমন একটি অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেয়েছি, একাধারে যা উদ্দীপনাময় এবং ভয়াবহ। রুশ বিপ্লবের ভূমিকাও একদিন নিঃশেষ হবে (কোনও কিছুর ভূমিকাই চিরস্থায়ী নয়)। কিন্তু, যে-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাশিয়ার মানুষ একদিন বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুলেছিল, বিপ্লবের ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে যাবার দীর্ঘকাল পরেও সেই চিন্তার খানিক অংশ যে বেঁচে থাকবে, ভবিষ্যতের মানুষকে আবার নতুন করে প্রেরণা দান করবে, তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তা-ই নয়, রুশ বিপ্লবের শিক্ষা থেকেই ভবিষ্যতের মানুষ বুঝতে পারবে, কোন্ পথ গ্রহণ এবং কোন্ পথ পরিহার করতে হয়। ইতিমধ্যে আমরা কী করব? রাশিয়াকে একটি প্রচণ্ড রকমের শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা ছাড়া আর কীই বা আমরা করতে পারি? শুধু আশা করতে পারি যে, যে ভয়ঙ্কর নির্মমতায় রাশিয়া একদিন ভ্রান্ত পথে এগিয়ে গিয়েছিল, ভ্রম-সংশোধনের বেলায় আর তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। আমার এই উপসংহার ঠিক সমাপ্তিসূচক হল না। তা আমি জানি। কিন্তু এমন সাধ্য নেই যে, শেষ কথা যাই বলে।

সমাপ্ত